স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৩য় বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ জুন- জুলাই ২০১৫

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্তের তরফে

ফ্ল্যাট: এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক

বিশাল বুক সেন্টার

৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬

ফোন: ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় - চিকিৎসা: নৈতিকতার সংকট ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ:

মারে ডাক্তার রাখে কে? বদল আনার বই ৪
দেশের নানা প্রান্ত থেকে ৭৮ জন ডাক্তার জানিয়েছেন কীভাবে এই চিকিৎসাব্যবস্থা কর্পোরেটগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে, আর মানুষ ঠকেন। সেই বই নিয়েই লিখেছেন **এষা মিত্র**

কিছু মনে করবেন না স্যার ১৪
ডাক্তাররা নিজেকে ভগবান ভাবেন, নাকি ভাবার ভান করেন? লিখছেন এক রোগী, **মনীষা আদক**

দুর্নীতিমুক্ত ডাক্তার—একটা খোঁজ ১৫
চলতি অবস্থায় ডাক্তারি করতে গেলে দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ না করে উপায় নেই। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, লিখছেন **ডা. সুমিত দাশ**

এই অবস্থায় কী করা যায়? ২২
যারা ডাক্তারি করছেন, প্র্যাকটিস বা চাকরিতে যুক্ত, তাঁরা বাণিজ্যিকতার আক্রমণ থেকে নিজেকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, রোগীদেরও অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা দিতে পারেন; কিন্তু পথটা সহজ নয়—বলছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা ২৫
ডাক্তার ভুল করেন, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলটা বোঝার পরও স্বীকার করতে চান ক-জন, আর রোগীর ওপর জোর করে ভুলটাই চাপিয়ে দেন ক-জন? প্রশ্ন তুলছেন এক চিকিৎসক-রোগী **মন্দাক্রান্তা সেন**

কুচিকিৎসার কথা ৪৯
চিকিৎসা করতে গিয়ে যেটা হচ্ছে সেটাকে অনেক সময় এর চাইতে ভালো নামে আর ডাকা যাচ্ছে না। কী হচ্ছে আর কেন হচ্ছে লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**

হরেকরকম ৭

হস্তমৈথুন

ফর্সা হবার ক্রিম

গরমে ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন? মাথা ঘুরে যেতে পারে

খাদ্য বিষয়ক কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার

চেনা ওষুধ অজানা কথা: ওমিপ্রাজোল ১৩

অ্যান্টিবায়োটিক ও তার অপব্যবহার ১৮
কারণে-অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে আমরা ভয়ানক বিপদ ডেকে এনেছি। এখন কী করা যায়? লিখছেন **ডা. মানস দাস**

হার্ট অ্যাটাক কি আটকানো সম্ভব ২০
হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের ভীতি ও উৎসাহ এ-দুয়েরই অন্ত নেই। হার্ট অ্যাটাক আটকানো নিয়ে বড়ো বেশি কথা লেখা হয় না, কিন্তু সেটা অনেকটাই সম্ভব— লিখছেন ডা. দেবাণু ঘোষরায়

একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কার ও একদল লড়াকু ডাক্তারের গল্প ২৭
লিখছেন **অর্ক বৈরাগ্য**

কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২ (প্রথম অংশ) ২৮
ডাক্তারদের কিছু পেশাগত নিয়ম ও নৈতিকতা মানতে হয়, আর সেসব ব্যাপারে আইনও আছে। খুব কম মানুষই সেসব জানেন। সেই নিয়মকানুন আর আইন-এর প্রথম অংশ অনুবাদ করেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস ও দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়**

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ৩১

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার ৩৩
ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবন ও শিক্ষা—
লিখেছেন **প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়**

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি: ব্রেস্ট ক্যানসার ৩৭
কিছুদিন আগে বিরল এক বংশগত স্তন ক্যানসারের আক্রমণ যাতে না হতে পারে তাই দু-টো স্তনই বাদ দিয়েছিলেন চিত্রতারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। সম্প্রতি বাদ দিলেন ওভারিও। ব্যাপারটা ঠিক কী? লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**

টিকার ইতিহাস ৪১
সফল টিকাকরণ আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এক বিরাট অবদান। কিন্তু টিকা দিয়ে স্মল পক্স দূরীকরণ, বা সম্ভাব্য পোলিও দূরীকরণ, এইসব সাফল্যের পেছনে আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। তারই দু-এক পাতা তুলে আনছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**

কৃমি
নিয়ে লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ** ৫২

খুশকি
নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন **ডা. জয়ন্ত দাস** ৫৪
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অভিজিৎ পাল**

ডা. শ্যামল ব্যানার্জী—একজন অনুচ্চারিত চিকিৎসকের নাম। ৫৭
সংকলক: স্বপন শীল

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: ❑ পাতিরাম, ❑ বুকমার্ক, ❑ পিপলস বুক সোসাইটি, ❑ বই-চিত্র, ❑ মনীষা গ্রন্থালয়, ❑ নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), ❑ এস কে বুকস (উল্টোডাঙা), ❑ শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ❑ লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭, ❑ কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়), ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ❑ ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ), ❑ বইকল্প (ঢাকুরিয়া), ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১), ❑ জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮), ❑ প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯), ❑ মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪), ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২), ❑ সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪), ❑ শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:

৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-এর গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

চিকিৎসা:নৈতিকতার সংকট

রোগীরা রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার যত্ন নিয়ে তাঁদের দেখবেন, বন্ধুর মতো আচরণ করবেন। যদি রোগীকে দেখে রোগ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পারেন তো চিকিৎসা শুরু করবেন; চিকিৎসায় রো২গী সাড়া দিলে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করবেন। অন্যথায় কেবল দরকারি পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠাবেন। ডাক্তার কেবল প্রয়োজনীয় ওষুধগুলোই লিখবেন, ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে ডাক্তারের যোগসাজশ থাকবে না। রোগীর কখনো মনেই আসবে না যে ডাক্তার রোগীর স্বার্থ ছাড়া অন্য কারণে ওষুধ বা পরীক্ষানিরীক্ষা লিখতে পারেন, বা অর্থের বিনিময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারেন। সোজা কথায়, ডাক্তার রোগীর ওপর (সরাসরিভাবে বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে) অন্ন ও সামাজিক মর্যাদার জন্য নির্ভরশীল। একজন সৎ মানুষ হিসেবে তাই তিনি যখন রোগীর স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তখন সেই কাজের জন্য আর কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন (যেমন ওষুধ কোম্পানি)-এর কাছ থেকে কোনোরকম সুবিধা নিতে পারেন না। কেননা রোগীর স্বার্থ আর ওষুধ কোম্পানির স্বার্থ অনেক সময় ঠিক বিপরীত হয়। ডাক্তার নিজের সুবিধামাফিক রোগীর ক্ষতি করে অপ্রয়োজনীয় সার্জারি, অকারণ সিজারিয়ান সেকশন, ইচ্ছেমতো রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, সস্তা ও কাজের ওষুধের বদলে দামি ওষুধ লিখতে পারেন না। তিনি রোগীর স্বার্থরক্ষা, এবং কেবলমাত্র রোগীর স্বার্থরক্ষাতেই নিযুক্ত; তাঁর পক্ষে অন্যরকম কিছু করা অনৈতিক।

এগুলো খুব সরল সত্য, কিন্তু এদেশে কথাগুলো আজ কেমন ব্যঙ্গ বলে বোধ হয়। এদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এখন অন্তত এরকম হয় না। কোনো দেশেই হয় কি? কিছুদিন আগেও কিন্তু এদেশে এই কথাগুলো এত অবাস্তব মনে হত না। অনেক নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তার ছিলেন, আর মানুষ তাঁদের ওপর এমন আস্থা হারায়নি। কিন্তু আজ অবস্থা এরকম দাঁড়াল কেন?

ডাক্তারদের তরফেও অনেক কিছু বলার আছে। তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে এসে রোগী প্রথম থেকেই আস্থা রাখতে চান না। সবসময় সন্দেহের এক বাতাবরণে ঘিরে থাকে ডাক্তার-রোগীর মিথস্ক্রিয়া। প্রবল প্রয়োজনেও পরীক্ষানিরীক্ষা করালে, রেফার করলে, কি একটু দামি ওষুধ লিখলে রোগী আস্থা হারান, ভাবেন, এই বুঝি ডাক্তার নিজেরটা গুছিয়ে নিতে রোগীকে মুরগি করছেন। এইভাবে ভালো ডাক্তারি করা যায় না। আর রোগী যখন এমনিতেও বিশ্বাস করবে না, রোগীর কিছু হলে ডাক্তারের ভুল না থাকলেও গালাগালি থেকে মারধোর করবে, তা হলে আর শুধু শুধু সাধু সেজে লাভ কী? সৎ মানুষ হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা যেকালে পাওয়া যেত সেকালে যেত, এখন পয়সা থাকলেই প্রতিষ্ঠা; তার সঙ্গে রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের একটু রসেবশে রাখলেই হল।

সত্যি কথা বলতে কি, ভালো ডাক্তারি করার চাইতে খারাপ ডাক্তারি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা বেশি সোজা। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা করালে ল্যাবরেটরি কমিশন তো দেবেই, চেনাজানা সবার কাছে ডাক্তারের গুণকীর্তনও করবে। দামি ওষুধ লিখলে ডাক্তার পাবেন ওষুধ-দোকানির সেলাম ও সহযোগিতা। অকারণে অন্য ডাক্তারকে রেফার করলে ডাক্তার-মহলে বন্ধু বাড়বে, ফলে বাড়বে পসার। আর মধ্যবিত্ত রোগী আজকাল কম খরচের চিকিৎসা করলে ভাবে, নাঃ, এ ডাক্তারটা 'আধুনিক' চিকিৎসা শেখেনি। অকারণ অপারেশন করলে ডাক্তারের দু-টো পয়সা আসে, রোগীও ভাবেন জব্বর একখান চিকিচ্ছে হল বটে তাঁর। লেবার রুমে কেঁদে-ককিয়ে নার্সদের হাতে নর্মাল ডেলিভারি? ছ্যাঃ, সমাজে মুখ দেখানো ভার; সব্বার কেমন এসি ঘরে পাঁচ-দশখান মুখবাঁধা ডাক্তারদের হাতে সিজার করে বেবি হচ্ছে!

অবশ্য সমস্ত রোগী এই ব্যয়সাপেক্ষ আলোকবৃত্তে আসতে পারবেন না, তাঁদের জন্য সরকারি অবহেলা বরাদ্দ আছে। কিন্তু গরিবগুরবো সেই রোগীরাও জানেন, পয়সাওলা ডাক্তার আর প্রাণপাত করেও তাঁদের হাতে টাকা ঢেলে দেওয়ার চিকিচ্ছে—আহা, এমন টাকার আলো মরি যদি সেও ভালো!

অন্যরকম কিছু সম্ভব ছিল কি? রাষ্ট্রের হাতে চিকিৎসার ভার, আর চিকিৎসকদের টাকা-বানানোর কল হবার হাত থেকে মুক্তি? ভালো চিকিৎসা করতে পারলে প্রাণ বাঁচানোর আনন্দ, আর সহকর্মী থেকে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা? ডাক্তারের ওপর রোগীর বিশ্বাস, আর ডাক্তারের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দেবার জন্য প্রাণপাত?

গল্পকথা মনে হচ্ছে? কিন্তু সেপথে পা বাড়ানোই হল না যে, কী করে বুঝবেন যে যেমনটি দেখছেন তেমনটি ছাড়াও অন্যরকম হতে পারত? সম্প্রতি ভারত সরকার নিযুক্ত শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের সমস্ত নাগরিকের চিকিৎসার ভার রাষ্ট্র নিলে এমন কিছু খরচ বাড়বে না। তাহলে ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা, ওষুধের দোকান, ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল—এরা সবাই রোগীর কাছ থেকে পয়সা নেবে না, ফলে অন্যরকম এক নৈতিকতা, অন্য চিকিৎসা-পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। ভারত রাষ্ট্র আপাতত তার নিজের গড়া কমিশনের সুপারিশ নাকচ করেছে, কিন্তু তা বলে তো আর কমিশনের বলা কথাগুলো মিথ্যে হয়ে যায়নি।

আমরা অন্যরকম সেই প্রভাতের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

মারে ডাক্তার রাখে কে? বদল আনার বই

এষা মিত্র

আমার বন্ধুর মা মারা গিয়েছেন সেপ্টিসেমিয়ায়, তিন বছর আগের জুনে। সল্টলেকের একটি ঝাঁ চকচকে বেসরকারি হাসপাতালে ছোট্ট অস্ত্রোপচারের পর যার সূচনা। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। কিন্তু বাড়িতে নিয়ে আসার পরদিনই ভয়াবহ অসুস্থ হওয়ার পর তাঁকে সল্টলেকেরই আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল, তিনি সেখানে ছিলেন ২৬ দিন, ভয়াবহ শ্বাসকষ্ট, এবং ক্রস ইনফেকশন! কিন্তু ক্রিটিকাল কেয়ারের চিকিৎসক এবং তাঁর সহকারী দিনের পর দিন বলে গিয়েছেন, অবস্থা স্থিতিশীল, চিন্তার কিছু নেই। এমনকী, যে দিন তাঁকে রক্ত দিতে হয়, সেদিনও সেই সহকারী একই কথা শুনিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলার আধ ঘণ্টা পরেই আমাকে জানানো হয়, মা-কে রক্ত দিতে হবে। অবস্থা স্থিতিশীল!

ব্রেন ডেথ হওয়ার পরেও তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল, এমনকী, কলকাতার এক বিখ্যাত বৃদ্ধ চিকিৎসককে এনে দেখানো হয়েছিল, আমাদের বলা হয়েছিল, বলা তো যায় না, যদি উনি কিছু করতে পারেন! (যদিও সেই চিকিৎসক নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভেন্টিলেশনে অহেতুক রাখার চেষ্টা যেন ওই ক্রিটিকাল কেয়ারের চিকিৎসকেরা না করেন।)

চিকিৎসকের এথিক্স! স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে ব্যাবসা। বন্ধুর মায়ের ভয়াবহ মৃত্যু, সব কিছুই নতুন করে রক্তক্ষরণ ঘটাল একটি বই—*ভয়েসেস অফ দ্য কনসেন্স ফ্রম দ্য মেডিক্যাল প্রফেশন*।

> এ ছাড়া রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা এবং বাণিজ্যিক হাসপাতালের টার্গেট পূরণের চাহিদার চাপ—সব কিছুই। ফলে রোগ নির্ণয়ের নামে রোগীর পকেট কাটা যাচ্ছে। রোগ থাকছে সেই তিমিরেই।

পুণের 'সাপোর্ট ফর অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ট্রেনিং টু হেলথ ইনিশিয়েটিভ'- এর (সাথী) একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল, দেশের ৭৮ জন চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে বইটি সম্পাদনা করেছেন দুই চিকিৎসক, অরুণ গাডরে এবং অভয় শুক্লা। ইংরেজিতে তার অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর গ্যাডগিল। বেসরকারি হাসপাতালে অনিয়ম, ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলির প্রভাব, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পণ্য করে তোলার পিছনে কর্পোরেট হাসপাতালগুলির প্রভাব এবং এই সমস্যার সমাধানের পথ—এমন সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে বইটিতে।

যে ৭৮ জন চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে বইটিতে, যাঁদের 'র‍্যাশনাল' চিকিৎসক বলে অভিহিত করা হয়েছে। ৬৬ জন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত সাতজন, বাকি পাঁচজন অলাভজনক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত। বড়ো থেকে ছোটো শহরে, বেসরকারি হাসপাতাল, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে যে দুর্নীতিচক্র সদাসক্রিয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে যে ব্যাবসাটি আমরা দেখতে পাই, এঁরা তার ভুক্তভোগী, ব্যবস্থার ভিতরে থেকে বা বাইরে থেকে চিকিৎসকদের অনিয়ম, দুর্নীতি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যাবসাজালের উদাহরণ অনুভব করেন দৈনন্দিন পেশাগত জীবনে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক জগতের তরফে ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির পালটা আন্দোলনের সেই বিবেক-মুখেরা কী বলছেন?

মুম্বইয়ের সিনিয়র ডায়াবেটোলজিস্ট বিজয় অজগাওঙ্কর তাঁর সাক্ষাৎকারে প্রথমেই সার কথাগুলো বলে দিয়েছেন। বলেছেন, একজন ডাক্তারের কাজ মানুষের সেবা করা। কেউ যদি বলেন, না, বাবা, এই সেবার চাপ আমি নিতে পারছি না বা পারব না, এটা আমার দ্বারা হবে না, তাহলে তাঁর ডাক্তারি পড়াই উচিত নয়।

বলেছেন, 'আমরা ব্যক্তি মানুষের চিকিৎসা করি না। করি ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, এক্স-রে, এমআরআইয়ের মতো কিছু সংখ্যার চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ পর্বে আমাদের মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করতে শেখানো হয়, ব্যক্তি মানুষ হিসাবে সামগ্রিক চিকিৎসা করতে নয়।'

প্রশ্ন তুলেছেন, একজন কমবয়সি রোগীকে, যাঁকে জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, তাঁকে জীবনদায়ী ব্যবস্থায় রাখা উচিত, কিন্তু কেন একজন বৃদ্ধকে, যাঁর বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাঁকে কেন ওই ব্যবস্থায় রাখা হয়, যার নিট ফল পরিবার-পরিজনের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া?

প্রশ্ন তুলেছেন, ইনসুলিনের পার ডোজ দাম ছিল ৫০ টাকা, তা কী করে ১৫০ টাকা হয়?

বিজয় অজগাওঙ্করের বাবা 'ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং অ্যাসোসিয়েশন একটি ছোট্ট হাসপাতাল তৈরি করেছিল, যেখানে কম তথা ন্যায্য খরচে চিকিৎসা হত। ক্রমে ব্যাবসায়িক সংস্থা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের 'কিনে নেয়' এবং সেটি একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালাতে পারেনি।

অজগাওঙ্করের এই মূল প্রশ্ন, অভিজ্ঞতার উদাহরণ রয়েছে বইয়ের ছত্রে ছত্রে। যেমন রোগীকে প্রথমেই গুচ্ছের টেস্ট দেওয়া বা গুচ্ছের ওষুধ গেলানো দিয়ে ব্যাবসা শুরু হয় বেসরকারি হাসপাতালে। একটি ছোট্ট শহরের চিকিৎসক জানিয়েছেন, যেকোনো ভাইরাল জ্বরে প্লেটলেট কাউন্ট বাড়ে, তিনি তেমন রোগীদের আলাদা করে নিয়মিত পরীক্ষা করেন বা রক্ত পরীক্ষা করান, কিন্তু এ ধরনের রোগীদের ভর্তি করানোর দরকার নেই।

অথচ তাঁর শহরে বেসরকারি হাসপাতালে সেই প্লেটলেট কাউন্ট বাড়লেই রোগীকে ভয় দেখিয়ে ভর্তি করানো হয়, স্রেফ স্যালাইন দেওয়ার জন্য। এমনকী, রোগীর পয়সাকড়ি আছে বুঝলেই তাঁকে সোজা আইসিইউতে পাঠানো হয়। বড়ো শহরের আরেক চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, হার্নিয়া অপারেশনের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে বিভিন্ন ব্যক্তির অপারেশন করানো হয়, চামড়ায় কতগুলো স্টিচস করে মোটা টাকার বিল ধরানো হয়। মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির চিকিৎসক সুভাষ পাটিল যা বলেছেন, তা আমাদের অপরিচিত নয়। রাত দু-টোয় কোনো রোগীকে নিয়ে তাঁর পরিজনেরা যখন হিমশিম, নির্দিষ্ট হাসপাতালে যেতে চাইছেন, রিকশা বা অটোচালক জানাচ্ছেন, তেমন হাসপাতাল আছে বলে তাদের জানা নেই! তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে অন্য হাসপাতালে। যেখানে চিকিৎসক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'কাট মানি'র বন্দোবস্ত রয়েছে।

এই কাট মানি ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার কাছ থেকে নেন চিকিৎসকেরা, সরাসরি, টাকা, উপহার এমনকী বিদেশযাত্রার মাধ্যমে, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবের কাছ থেকে নেন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সরকারি হাসপাতালে সরকারের নজর কমছে, পিপিপি মডেলে বিভিন্ন পরিষেবা সুলভে দেওয়ার নামে বেসরকারি সংস্থাকে ঢোকানো হচ্ছে, ফলে রোগীর পকেটে টান। সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নত না হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতাল হয়ে যাচ্ছে ভগবান, সেখানে ঢুকলে ঘটিবাটি বিক্রি হওয়ার উপক্রম! এই বইয়ে যেগুলোকে বলা হয়েছে 'হাসপাতাল মল'!

আর যে চিকিৎসকেরা দিনের পর দিন এগুলো করে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের মানসিকতা কীরকম? ছত্তিশগড়ের শহীদ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. জানা বলেছেন, মেডিক্যাল ছাত্র পাস করে বেরোনোর পরেই ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার শিকার হয়ে ওঠে, বলা ভালো নিজেদের হতে দেয়। এই সব সংস্থার কাছ থেকে উপহার নেওয়া যে আদর্শবিরোধী, সে বিষয়ে তাদের ভ্রূক্ষেপই নেই। বরং উপহার পাওয়াটাকে অধিকার বলে মনে করে। এই উপহার নেওয়া, সুবিধা নেওয়া, রোগীকে শুষে নেওয়ার মানসিকতার সঙ্গে বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। বর্তমানে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে জোর দিচ্ছে। কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠানে ফি কত? লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পড়াশোনা করে ডাক্তার হওয়ার পর সেই টাকা তুলে নেওয়ার মানসিকতা কাজ করছে নব-চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে।

সে তো নব-চিকিৎসকদের কথা। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদের একাংশের মানসিকতা বুঝিয়েছেন একটি বড়ো শহরের সার্জন। তাঁরা একটি সম্মেলন করবেন বলে স্থির করেন, এ-ও ঠিক করেন, কোনো ফার্মাসিউটি-ক্যাল সংস্থার বদান্যতা নেবেন না, তাই থাকা-খাওয়ার খরচ তুলতে চিকিৎসকেরাই একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ১২০০ অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকের মধ্যে মাত্র ২০০ জনের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের করতে হয়েছে, বাকিদের সব খরচই দিয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা। ওই সার্জনের মন্তব্য, 'ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে কী দোষ দেব? ওরা তো আমাদের কিনে নিয়েছে, ন্যূনতম আদর্শ, নৈতিকতাও কারও মধ্যে নেই।' চিকিৎসকেরা নিজেরাই জানিয়েছেন, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনসিসের বদলে গুচ্ছের পরীক্ষা এবং যন্ত্রনির্ভরতা বাড়ছে। বাড়ার কারণ কী? ক্লিনিক্যাল ডায়গনসিসের ক্ষমতার অভাব, তারজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব, রোগী মারা গেলে মামলার ভয় এগুলো কয়েকটা কারণ।

এ ছাড়া রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা এবং বাণিজ্যিক হাসপাতালের টার্গেট পূরণের চাহিদার চাপ—সব কিছুই। ফলে রোগ নির্ণয়ের নামে রোগীর পকেট কাটা যাচ্ছে। রোগ থাকছে সেই তিমিরেই।

স্বাস্থ্য পরিষেবা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূলত যে দুই দানবকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই বইয়ে, তার একটি ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা, অন্যটি কর্পোরেট বা বেসরকারি হাসপাতালের বাণিজ্যচক্র।

যেমন কলকাতার চিকিৎসক জয়ন্ত দাস জানিয়েছেন, ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার নতুন কৌশলের কথা। তিনি জানাচ্ছেন, ১ টাকারও কম দামের অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল ডক্সিসাইক্লিন এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা ডক্সিসাইক্লিনের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ল্যাক্টোব্যাসিলাস মিশিয়ে যে ক্যাপসুল বাজারে এনেছে তার দাম পাঁচ টাকা। ফলে চিকিৎসকেরা সেগুলিই দিতে অনেক সময় বাধ্য হন।

যত বেশি সংখ্যক রোগী ভর্তি করানো, তাঁদের উপর যত সম্ভব বেশি পরীক্ষা করা, এমনকী, অস্ত্রোপচার করানোর যে 'টার্গেট' চিকিৎসকদের উপর থাকে, তার উদাহরণ দিয়েছেন কলকাতার চিকিৎসক পার্থপ্রতিম পাল। তিনি জানিয়েছেন, ইসিজিতে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ায় একজন শহরের নামকরা এক কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান। তিনি প্রথমে ইকো-কার্ডিওগ্রাম করেন, তারপর অ্যাঞ্জিওগ্রাম করেন এবং অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে বলে জানান। ওই ব্যক্তি তখন পার্থবাবুর কাছে এলে তিনি ইসিজি করেন এবং দেখেন যে ওই ব্যক্তির কোনো সমস্যা নেই!

কিন্তু সমস্যার কথা আমরা কমবেশি সকলে জানি, উত্তরটা কী?

স্বাস্থ্য পরিষেবার বাণিজ্যিকিকরণের থেকে মুক্তি কোথায়? পুণ্যব্রত গুণের মতো বেশ কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা (ইউনির্ভাসাল হেলথ কেয়ার) চালু করার কথা। ব্রিটেনে বা শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের ৪০ শতাংশ দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যেখানে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা জনগণের দেওয়া করের টাকা থেকে জনগণের চিকিৎসার খরচ বহন করে। হাসপাতালে ঢুকলে রোগীকে সরাসরি টাকা দিতে হয় না। সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করলেও সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও রয়েছে (ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে)। সামাজিক আন্দোলন বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছেন অনেকে।

কিন্তু করে কে? কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে এই নজরদারি ব্যবস্থার অভাব দেখিয়ে দিয়েছিল; টাকা নেওয়ার কলের তলায় রোগী সুরক্ষার অন্ধকার দিকটিও দেখিয়েছিল। অথচ রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন সেই হাসপাতাল চালু করার অনুমতি না দেওয়ায় শিল্পসংস্থা রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারে, এমন কথাও সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল; এই হাসপাতাল খুলতে না দেওয়া যে সরকারের শিল্পবিরোধী নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয়, তা-ও বলা হয়েছিল। ফলে আমাদের সামাজিক মনোভাবও বোঝা দরকার।

এ সব কিছু নিয়েই ভেবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে এই বইটি। স্বাস্থ্য ব্যাবসার ভুক্তভোগী হয়েও যারা গুমরে মরি, তাঁদের কাছে অন্তত এই

আশ্বাসটুকু বইটি দিতে পেরেছে, পালটা আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে চিকিৎসকদের মধ্যে থেকেও। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। একজোট হয়ে অন্তত চিকিৎসকেরাই তো বলতে শুরু করেছেন, চলছে না, চলবে না।

এই বইয়ে কলকাতার কার্ডিওলজিস্ট গৌতম মিস্ত্রি জানিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে তাঁকে জ্বরজারি সারানোর কাজেই মূলত ব্যবহার করা হত। বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি যান একটি কর্পোরেট হাসপাতালে। সেখানে রোগীকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশিদিন হাসপাতালে রাখার চাপ, অপ্রোয়জনীয় পরীক্ষা করানোর চাপ, অস্ত্রোপচার করানোর চাপ নেবেন না বলে সেটাও ছাড়েন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি হৃদ্‌রোগ কনসালট্যান্ট। রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের শুশ্রূষা করেন, তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করেন, যাতে রোগীকে হাসপাতালে যেতে না হয়, অকারণ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি আর বাইপাসের খপ্পরে পড়তে না হয়।

> কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে এই নজরদারি ব্যবস্থার অভাব দেখিয়ে দিয়েছিল; টাকা নেওয়ার কলের তলায় রোগী সুরক্ষার অন্ধকার দিকটিও দেখিয়েছিল।

মায়ের কার্ডিওলজিস্ট সল্টলেকের সেই হাসপাতালে আমার বন্ধুর মা-কে দিনে দু-বার-তিনবার দেখতে যেতেন, হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডক্টরের চাপ সত্ত্বেও পেসমেকার বসাতে দেননি, বলেছিলেন, 'ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র আমি ভালো বুঝি, বাইপাসের কোনো দরকার নেই। আপনারা অন্য চিকিৎসা করুন।' একটি দিনের জন্য ফি নেননি। শেষদিন বলেছিলেন, 'যাঁকে ফেরাতে পারিনি, তাঁর পরিজনের কাছ থেকে ফি নিই না। এটা আমার নীতি।'

স্বাস্থ্য ব্যবসার বিপরীতে এই মানুষগুলোর লড়াই-ই এই বই, পরবর্তী আন্দোলনের ভিত্তিও।

| লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। |

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

ধারাবাহিক

হস্তমৈথুন

এটা তো খুব ভালো বাংলা, তৎসম শব্দ, তবু ভদ্র সমাজে কথাটা চলে না; আর এর চালু বাংলা প্রতিশব্দ ছেলে-ছোকরাদের রকের আড্ডার স্ল্যাং বলেই ধরা হয়। তবু, আমরা চাই না চাই, হস্তমৈথুন, ইংরাজিতে ম্যাস্টারবেশন (masturbation), এই জিনিসটা আছে বহুকাল থেকেই। এটা হল মানুষের 'একক যৌন আচরণ' (solitary sexual behavior বা auto-eroticism)-এর একটা উদাহরণ।

হস্তমৈথুন ব্যাপারটা কী?

হস্তমৈথুন বলছি বটে, কিন্তু সবসময় যে যৌন-উত্তেজনা পাবার জন্য হাত ব্যবহার করা হয় তা নয়। হাত ছাড়াও নানা জিনিস, যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে রাবারের তৈরি 'পুতুল' বা কেবল 'গর্ত', বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়; মেয়েরা ভাইব্রেটর, ডিলডো ইত্যাদি হালফ্যাশনের যন্ত্র যেমন ব্যবহার করেন, বোধকরি তার চাইতে বেশি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন সহজপ্রাপ্য নানা জিনিস, যথা বোতল, শশা ইত্যাদি। আর অন্যের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রেও হাত দিয়ে জননাঙ্গ উত্তেজিত করা যেতে পারে, করা হয়েও থাকে। সেক্ষেত্রে হস্তমৈথুন শব্দটা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় না।

আমাদের ধারণা কেমন?

আমাদের দেশে একটা ধারণা বহুল প্রচলিত—চল্লিশ ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয়, সময় লাগে চল্লিশ দিন, আর বীর্য জমা থাকে মাথার ভেতর। সেই বীর্য ক্ষয় না করে ধরে রাখতে পারলে (ব্রহ্মচর্য) নানাবিধ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। ফলে হস্তমৈথুন আর সুপ্তিস্খলন (ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত) নিয়ে আমাদের এমনিতেই ভয়ের অন্ত নেই। তার ওপর আমাদের দেশে সাহেব ডাক্তাররা যখন ছিলেন তখন পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যা অনেকটাই প্রচলিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল, আর চার্চ ভাবত হস্তমৈথুন হল পাপ। সুতরাং সাহেব ডাক্তাররা প্রায়শই সেরকমই শিখিয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় অনেক স্বাস্থ্যপত্রিকা চালু ছিল। সেগুলোতে হস্তমৈথুনের নানা শারীরিক-মানসিক-সামাজিক কুফল নিয়ে লেখা হত। হস্তমৈথুনে স্বাভাবিক যৌনক্ষমতা লোপ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ভাবা হত।

এখনও অনেক 'রোগী' ডাক্তারের কাছে যান ভয় পেয়ে—''ডাক্তারবাবু, ছোটোবেলায় খুব ইয়ে করেছি, এখন বিয়ে করে ওইটা করতে ঠিক পারব না মনে হচ্ছে।' ট্রেনে বাসে ল্যাম্পপোস্টে ছোটো ছোটো হ্যান্ডবিল সাঁটেন নানা স্বঘোষিত হাতুড়ে সেক্সোলজিস্ট, চেম্বারে টেনে আনার জন্য হ্যান্ডবিলে জিজ্ঞাসা করেন, ''কৈশোর-যৌবনের কুঅভ্যাসের দোষে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছেন?'' 'কুঅভ্যাস' মানে যে হস্তমৈথুন সেটা সবাই বুঝে যান। মেয়েদের ভাগ্য ভালো, তাঁদের হস্তমৈথুন যে সম্ভব, এবং অতি সাধারণ ঘটনা, সেটা সমাজে স্বীকৃত নয়, তাই ধামাচাপা পড়ে থাকে, এবং তাঁরা ''কৈশোর-যৌবনের কুঅভ্যাসের দোষে নারীত্বহীনতায় ভুগছেন?'' কিনা সে প্রশ্ন হ্যান্ডবিলে থাকে না।

এ ছাড়া হস্তমৈথুনে কী কী কুফল হতে পারে? ক্লান্তি, অবসাদ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথাব্যথা, অখিদে, রোগা হয়ে যাওয়া, ক্ষয়রোগ (টিবি), বন্ধ্যাত্ব, ও অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু। প্রমাণ? প্রমাণের দরকার নেই, হস্তমৈথুন খারাপ ব্যাপার, আর খারাপ ব্যাপার থেকে খারাপ ফল ফলবে, সেটা কে না জানে!

হস্তমৈথুন নিয়ে সত্যিটা কী?

পুরুষত্বহীনতা (বা মেয়েদের যৌন-উত্তেজনাহানি), ক্লান্তি, অবসাদ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মাথাব্যথা, অখিদে, রোগা হয়ে যাওয়া, ক্ষয়রোগ (টিবি), বন্ধ্যাত্ব, ও অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু—এগুলোর কোনোটার সঙ্গেই হস্তমৈথুনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। হস্তমৈথুনের পরে পরেই শারীরিক ক্লান্তি স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা যৌনসম্পর্কের পরেও হয়ে থাকে। যৌনতা নিয়ে অকারণ শুচিবায়ুগ্রস্ততা হল এইসব ধারণার মূল।

অনেকেই হস্তমৈথুন করেন আর ভীষণ পাপবোধে ভোগেন। পাপ-পুণ্য নিয়ে ডাক্তারের বলার কিছু নেই, খালি শরীরে-মনে হস্তমৈথুনের প্রভাব নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। এখন এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিজের যৌনতৃপ্তির জন্য হস্তমৈথুন করেন অধিকাংশ মানুষ। ''বিয়ের আগে করেছি, পরে করি না''—এটাও সত্যি নয় সবক্ষেত্রে। ''হস্তমৈথুন প্রাকৃতিক নয়''— একথাটা যাঁরা বলেন তাঁদের জেনে রাখা ভালো গরিলা-শিম্পাঞ্জি-বানর, ডলফিন, হাতি, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি বহু প্রাণীই নিজের যৌন-উত্তেজনা ও যৌনতৃপ্তির জন্য নানাভাবে যৌনাঙ্গ উত্তেজিত করে। ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব ধরে অনেকে বলেন, হ্যাঁ, বয়ঃসন্ধির সময় হস্তমৈথুন স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সেটা হল অপরিণত মনের লক্ষণ। কিন্তু এতাবৎ কোনো সমীক্ষাই প্রমাণ করেনি যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হস্তমৈথুন করেন তাঁরা কোনোভাবে অন্যদের চাইতে অপরিণত, বা আলাদা রকমের মানুষ। তবে যৌনসঙ্গী থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ সেদিকে না তাকিয়ে কেবল হস্তমৈথুন করেন, সঙ্গীর সঙ্গে যৌনতৃপ্তি পেতে অক্ষম হন, তাহলে সেটা 'অস্বাভাবিক' কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলাই যায় যে ব্যাপারটা অসুবিধাজনক সন্দেহ নেই। আর এরই জের টেনে বলা হয়, হস্তমৈথুন নেশার মতো অভ্যাসে পরিণত হয়, আর তাই স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌনসম্পর্কে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এটা মোটেই প্রমাণিত নয়। বরং দেখা যাচ্ছে যারা আগে কখনো হস্তমৈথুন করেননি, তাঁরা স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক স্থাপনের পথে কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারেন। আবার, যাঁদের যৌনসঙ্গী নেই, বা যৌনসঙ্গীর যৌন-আগ্রহ তুলনায় কম, তাঁদের ক্ষেত্রে হস্তমৈথুন তৃপ্তি দিতে পারে, টেনশন কমাতে পারে, এবং সে জন্য কমবয়সী হতে হবে এমনটাও নয়।

কিন্তু এইসব পরিসংখ্যান থেকে আবার উলটোটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। অর্থাৎ যারা হস্তমৈথুন করেন না, তাঁদের অস্বাভাবিক ভাবার কোনো মানে নেই। আসলে এটা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার।

ফর্সা হবার ক্রিম

ফর্সা হবার জন্য কেন ভারতীয়রা সাধ্যসাধনা করেন, বিশেষ করে মেয়েরা, সেটা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করা যাবে কোনো এক সময়, আপাতত দেখি এদেশে ফর্সা করার ক্রিমগুলো কতটা কাজের।

ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি

ফর্সা করার ক্রিমগুলোর মধ্যে প্রথমেই যে নামটা মনে আসে সেটা হল ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। তার অবশ্য কারণ আছে। সেই ১৯৭৫ সাল থেকে হিন্দুস্থান ইউনিলিভার এটা বিক্রি করছে। এতদিন ধরে মহা শক্তিশালী এক কর্পোরেট হাউসের হাতে থেকে এটা একটা সুপার ব্র্যান্ড। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিমের আবার গোটা সাত-আট রকম আছে; কোনোটা মাল্টিভিটামিন, কোনোটা ছেলেদের জন্য, কোনোটা আবার আয়ুর্বেদিক। প্রসঙ্গত, হিন্দুস্থান ইউনিলিভার কোম্পানিরই মালিকানায় রয়েছে পন্ডস ও ল্যাকমে। এরা আবার নিজেদের নামে আলাদা আলাদা ফর্সা করার ক্রিমগুলো বাজারে ছেড়েছে। প্রত্যেকেই বলে নিজেরটা শ্রেষ্ঠ। এটাই বাজারের কায়দা।

সেসব কথা ছেড়ে আমরা আসি আসল প্রশ্নে। এদেশে ফর্সা করার ক্রিমগুলো ফর্সা করে কি? করলে, কতটা করে? কোনো ক্ষতি করে না তো? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে কয়েকটা মূল ব্যাপার জেনে নিতেই হবে।

কে ফর্সা, কেন ফর্সা?

আমরা কালো হব না ফর্সা সেটা মূলত নির্ভর করে আমাদের ত্বকে মেলানোসাইট কোষগুলো কতটা মেলানিন তৈরি করছে তার ওপর। মেলানিন হল বাদামি-কালো রঙের একটা পদার্থ। ত্বকে মেলানোসাইট কোষগুলো কতটা মেলানিন তৈরি করবে সেটা নির্ভর করে দু-টো জিনিসের ওপর। প্রথমত, জেনেটিক বা বংশগত কারণ, সেটা পরিবর্তন করার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, দেহের অংশবিশেষের ধর্ম (যেমন যৌনাঙ্গ বুকের চাইতে কালো হয়)। তৃতীয়ত, পরিবেশ বা মূলত সূর্যের আলো বা রোদ। রোদ লাগলে আমাদের চামড়া কালো হয়ে যায়। তাই দেহের ঢাকা অংশগুলো খোলা অংশের চাইতে সাধারণভাবে ফর্সা হয়।

ফর্সা করার ক্রিম কীভাবে কাজ করে?

এইবার দেখি কীভাবে কাজ করতে পারে ফর্সা করার ক্রিম। সবচেয়ে সহজবোধ্য কাজ হল সানস্ক্রিন হিসেবে কাজ করা। সূর্যের রোদের নানা অংশ আছে, সব অংশ সমান কালো করে না। সূর্যের আলোর আল্ট্রাভায়োলেট অংশ (আল্ট্রাভায়োলেট-এ এবং আল্ট্রাভায়োলেট-বি, সংক্ষেপে ইউভি-এ ও ইউভি-বি) আমাদের চোখে অদৃশ্য, কিন্তু এরাই আমাদের রং কালো করে বেশি। সানস্ক্রিনের নানা কেমিক্যালে নানাভাবে ইউভি-এ ও ইউভি-বি আটকে যায়। ফলে চামড়ায় সূর্যের আলো লাগলেও কালো হয় কম।

এ ছাড়া আছে অন্য কিছু কেমিক্যাল। তাদের মধ্যে চামড়ার কালো রং কমাতে সবচেয়ে কাজের হল হাইড্রোকুইনোন। কিন্তু কাজের হলে কী হবে,

নানা কারণে এই রাসায়নিকটি কেবলমাত্র ডাক্তারি তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা যায় এমন আইন করা হয়েছে। প্রসাধনদ্রব্য, যা কিনা মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে, তাতে হাইড্রোকুইনোন দেওয়া ঠিক নয়। নিয়াসিনামাইড, ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, এবং আরও কিছু জিনিস নানা ফর্সা করার ক্রিমে থাকে। এদের কার্যকারিতা কম, অনেক সময় পুরো পরীক্ষিতও নয়। এ ছাড়া থাকে কয়েকটা জিনিস, যেগুলো ঠিক কী কেমিক্যাল তা ক্রিমের লেবেল-এ, বা কোম্পানির ওয়েবসাইটে বলে দেওয়া হয় না; যেমন পারফিউম, এবং 'হোয়াইট অপটিকস'। পারফিউম-এর কাজ সহজবোধ্য। 'হোয়াইট অপটিকস' জিনিসটা ত্বকের ওপর সাদা আস্তরণ, যেটা থাকার ফলে সাময়িকভাবে চামড়াকে সাদা দেখায়, আর ব্যবহারকারী খুশি হন; কিন্তু ত্বককে ফর্সা করতে এর কোনো ভূমিকা নেই। 'আয়ুর্বেদিক' বা 'হার্বাল' নামধারী যেসব ফর্সা করার ক্রিম আছে তাদের মধ্যে নানা ভেষজ পদার্থ থাকে; নামগুলো ভারি সুন্দর—লোধ্র, মঞ্জিষ্ঠা। সেগুলো কেমন করে কাজ করে তার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মানুষ 'আয়ুর্বেদিক' 'প্রাকৃতিক', 'হার্বাল' ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস করেন বলে কেনেন। ক্রিমে ঠিক ওই জিনিসগুলো আছে কিনা কেমিক্যাল টেস্ট করে সেটা বলাও ভারী শক্ত। তবু কোম্পানির কথার ওপর বিশ্বাস করলেও মুশকিল থেকে যায়, কেননা এগুলো কাজ করে কিনা, নিরাপদ কিনা, সেসব বলার মতো পরীক্ষানিরীক্ষার অভাব রয়েছে, সবটাই ঐতিহ্য ও পরম্পরার ওপর আস্থা রাখার ব্যাপার।

ফর্সা করার ক্রিমের দাবির যুক্তিবিচার

আয়ুর্বেদিক হোক আর নাই হোক, ফর্সা করার নানা ক্রিমে যেসব দাবি করা হয় তাদের কয়েকটা অন্তত যুক্তির বিচারে বেশ নড়বড়ে। সানস্ক্রিন হিসেবে তাদের কিছুটা ফর্সা করার ক্ষমতা থাকতেই পারে, বিশেষ করে যদি সেটা মুখে নিয়মিত মাখা হয়। কিন্তু মুখের নানা জায়গার কালচে ভাব তুলে দেবে কী করে? ডাক্তারবাবুরা যখন মুখে 'স্পট' তথা কালো দাগ তোলার ওষুধ দেন, তখন তাঁদের বলতেই হয়, ওষুধটা কেবল কালো দাগে লাগাবেন, আশেপাশে যত কম লাগে ততই ভালো। ওষুধের তো এমন ম্যাজিক-বুদ্ধি

নেই যে সেটা কেবল কালো দাগে কাজ করবে আর অন্য জায়গায় করবে না। সারা মুখে লাগালে সারা মুখটাই সমভাবে সাদাটে হবে, ফলে কালো দাগটা একটু ফর্সা হলেও আশেপাশের চামড়ার তুলনায় আগের মতোই কালো থেকে যাবে। অথচ সমস্ত ফর্সা হবার ক্রিম দাবি করে যে সারা মুখে মাখলে রং ফর্সা হবে (যেটা খানিকটা সম্ভব), মুখের দাগ দূর হয়ে যাবে (যেটা হবার যৌক্তিক ভিত্তি নেই)। বিশেষ করে 'ডার্ক সার্কেল' বা চোখের চারিদিকের কালচে ভাব দূর হবার আশা দেয় তারা, মেচেতা বা অন্যসব কালো দাগ কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহে মিলিয়ে যাবার কথা বলে—এসব একেবোরেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনে গোরু গাছে চড়ে বটে, বিজ্ঞানে তো চড়ে না। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো খুব সতর্ক। তারা ছোটো অক্ষরে লিখে দেয়, তাদের এইসব দাবি তাদের কনজিউমারদের ওপর পরীক্ষা করে প্রাপ্ত (*Based on a 4 weeks consumer study, 2010, Based on consumer study, 2011 এইরকম কথা)। নিজেদের করা পরীক্ষার ফল নিজেদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা, আর চার সপ্তাহের পরীক্ষা করা, এসব জিনিসগুলো খুব নির্ভরযোগ্য নয়।

কতটা নিরাপদ ফর্সা হবার ক্রিম?

কিন্তু জিনিসগুলো নিরাপদ তো? কোম্পানি ওয়েবসাইট তো বলে তাদের ক্রিম খুব নিরাপদ। একটা উদাহরণ দিই। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি তাদের একটা ক্রিম সম্পর্কে লিখছে ''. . . as an everyday use cosmetic, Fair & Lovely Advanced Multi Vitamin is not known to have any adverse side effects. This is based on not only the use of internationally approved cosmetic ingredients but also extensive consumer and dermatologist conducted clinical evaluations.'' কিন্তু এটা কি সম্ভব? এই ক্রিমের নানা কিছুর মধ্যে আমরা যদি শুধু সানস্ক্রিনটাই দেখি Parsol MCX, Parsol 1789 & TiO2, তাহলে দেখব এদের প্রত্যেকটির কিছু অসুবিধে বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ছাড়া অন্য অনেক প্রোডাক্টে সানস্ক্রিন হিসেবে Parsol MCS, Parsol 1789 & TiO2 ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং তাদের নানা অসুবিধা ধরা পড়েছে। ইউনিলিভার কোম্পানির নিজস্ব 'বহুল কনজিউমার ও ত্বকরোগ-বিশেষজ্ঞ দ্বারা ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন'-এ (extensive consumer and dermatologist conducted clinical evaluations) কিছু অসুবিধা পাওয়া না গেলেও সেটার চাইতে স্বাধীনভাবে করা ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন বেশি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কোম্পানি সেটা লিখবে না। হয়তো কসমেটিক্স অ্যাক্ট অনুসারে স্বাধীন ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন দিতে কোম্পানি বাধ্য নয়, কিন্তু তাই বলে তো আর সত্যিটা বদলে যাবে না।

তা ছাড়াও রয়েছে পারফিউম। সমস্ত ধরনের কসমেটিক জিনিসে যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি চামড়ায় অ্যালার্জি করে তা হল পারফিউম বা গন্ধদ্রব্য। লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রায় সব ফর্সা হবার ক্রিমে পারফিউম আছে। অথচ তাদের প্যাকেজ ও ওয়েবসাইট ঘেঁটে 'পারফিউম আছে' বড়োজোর এটুকুই জানা যায়, কোন পারফিউম আছে সেটা পাওয়া না যাওয়াই দস্তুর। কারণ? সর্বজ্ঞ না হয়েও কারণটা বলা যায়—পারফিউমের নাম থাকলেই তার নানা ক্ষতির কথা মানুষ সহজেই জানবে। এ ছাড়া অনেক ফর্সা হবার ক্রিমের উপাদানগুলো কোথাও কোথাও খুলে বলা থাকে না। সেখানে হয়তো হাইড্রোকুইনোন ব্যবহার করা হয়। আমরা আগেই দেখেছি এই রাসায়নিকটি আইনত কেবলমাত্র ডাক্তারি তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা যায়। প্রসাধনদ্রব্য মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে, তাতে হাইড্রোকুইনোন দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু দিলে ধরা পড়ে কি, বিশেষ করে এই ভারতে? অনেক ফর্সা হবার ক্রিমে পারদ থাকে, আর সেটা পুরো বেআইনিও নয়; কিন্তু মাত্রা বেশি হলে খুব ক্ষতিকর। ফর্সা হবার ক্রিমে স্টেরয়েড দিলে দ্রুত ফর্সা হওয়া যায়, কিন্তু ত্বকের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। যেহেতু ভারতে কসমেটিক নিয়ে আইন ঢিলেঢালা, আর আইনের প্রয়োগ আরও ঢিলে, তাই এ-সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়ুর্বেদিক ক্রিমে উদ্ভিজ স্টেরয়েড আসতে পারে, সেগুলো মানুষের শরীরে কতটা ক্ষতি করতে পারে সেটা অনেক ক্ষেত্রে অপরীক্ষিত; যেটুকু পরীক্ষা হয়েছে তা দিয়ে আশঙ্কা নির্মূল হবার কারণ ঘটেনি।

ফর্সা হবার ক্রিম নয়, কিন্তু ফর্সা হবার জন্য ব্যবহার করা হয়!

একধরনের ক্রিম কোনো কোম্পানিই 'ফর্সা হবার ক্রিম' হিসেবে বাজারে পাঠায় না, বিজ্ঞাপন করে না, কিন্তু ওষুধ দোকানের দোকানদার, 'বিউটি পার্লার', কিছু হাতুড়ে এবং কিছু অসাধু ডাক্তারের সৌজন্যে এগুলো বাজারে 'ফর্সা হবার ক্রিম' হিসেবে খুব চলছে। এগুলো স্টেরয়েড ক্রিম, নানা চর্মরোগের চিকিৎসায় এগুলো খুব কাজে লাগে, এবং ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত এইসব ক্রিম বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু ভারতে এইটা আকছার হচ্ছে। বেটনোভেট, প্যানডার্ম প্লাস ইত্যাদি নানা নাম এখন পাড়ার দিদি-দাদা-মাসিরা বাতলে দিচ্ছেন কালো মেয়ের উপকারের জন্য। প্রথমে খানিক ফর্সা হয়েই কিছুদিন বাদে মুখ হয়ে যাচ্ছে লাল, ব্রণশোভিত, আর সবসময় জ্বালা আর চুলকানি। কিন্তু এটা নিয়ে এখানে বেশি আলোচনা করার দরকার নেই।

কয়েকটি বাজার-চলতি ফর্সা হবার ক্রিম

১। 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' (সাত-আটটা ধরন)
২। গার্নিয়ার লাইট ফেয়ারনেস ডে ক্রিম
৩। ওলে ন্যাচারাল হোয়াইট অল ডে ক্রিম
৪। নিউট্রোজেনা ফাইন ফেয়ারনেস লোশন
৫। রেভলন টাচ অ্যান্ড গ্লো
৬। ভিকো টার্মারিক ক্রিম
৭। লোটাস হার্বালস হোয়াইট গ্লো
৮। ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ফেয়ারনেস ক্রিম
৯। লোরিয়াল প্যারিস পার্ল পারফেক্ট ফেয়ারনেস ডে ক্রিম
১০। ল্যাকমে পারফেক্ট রেডিয়ান্স ইনটেন্স হোয়াইটনেস ডে ক্রিম
১১। পন্ডস হোয়াইট বিউটি
১২। নিভিয়া ভিসেজ স্পার্কলিং গ্লো।

গরমে ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন!

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরেও কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। মানবশরীরের সঙ্গে পরিবেশের নিবিড় যোগাযোগের এক অন্যতম উদাহরণ এটা। গরমকালের এমন বেশ কিছু পরিবর্তন শরীরের সহ্যক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেলেই দেখা দেয় বিভিন্ন অসুখবিসুখ। এমনই এক জরুরি শারীরিক অবস্থা বা অসুখের নাম ''সিনকোপ'' (syncope)। সিনকোপ নানান কারণেই হতে পারে। তবে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে সেই কারণগুলো যেগুলো সাধারণত গরমকালে বাসে বা ট্রেনে মাথা ঘুরে যাওয়ার জন্য দায়ী। পাশাপাশি এটাও উল্লেখযোগ্য যে সামান্য কিছু সাবধানতা বজায় রাখলে এই ঘটনাকে প্রতিরোধ করা যায়। তা সত্ত্বেও যদি মাথা হঠাৎ ঘুরে যায় তাহলে সামান্য কিছু ব্যবস্থা নিলেই রোগীকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

''সিনকোপ কী?''

সাধারণত হঠাৎ করে শরীরের পেশিসমূহ যদি দুর্বল হয়ে আসে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা লোপ পায় আর জ্ঞান হারিয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় সিনকোপ। মাথা ঘুরে যাওয়া বলা হলেও, মাথা বা চারপাশ যে ঘুরতে থাকে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারেন যে তাঁর এরকম কিছু হতে চলেছে। মাথার হালকাভাব, দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে আসা, পা দু-টো ভারী ভারী লাগা, উপসর্গের এই ক্রমানুসরণে রোগী শেষত অজ্ঞান হয়ে পড়েন, আর মাটিতে পড়ে যান।

গরমে সিনকোপ কেন?

মূলত মস্তিষ্কে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে মস্তিষ্ককাণ্ডে (brainstem) রক্ত চলাচল একটা মাত্রা থেকে কমে গেলে সিনকোপ হয়। গরমে অনেকক্ষণ ধরে জল না খেলে যদি রক্তের পরিমাণ ও রক্তচাপ কমে যায় তাহলে এরকম হতে পারে। আবার অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণেও সিনকোপ হতে পারে। আসলে আমাদের হাঁটার সময় পায়ের পেশির সংকোচনের ফলে পায়ের দিক থেকে রক্ত ঠিকঠাক হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, আর এভাবেই শরীরে সঞ্চালিত রক্তের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই একনাগাড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সেই ভাণ্ডারে ঘাটতি হতে থাকে। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত কম পৌঁছোয় আর রোগী সিনকোপে আক্রান্ত হন। এর পুরো নাম ''ভেসোভেগাল সিনকোপ'' (vasovagal syncope)। আমরা প্রায়শই দেখে থাকি যে গরম জনবহুল বাসে বা ট্রেনে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঘাম, বমিভাব, দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে তা হঠাৎ হাজির হতে পারে যেকোনো ট্রেনযাত্রীর জীবনে।

তাহলে কী করণীয়?

হঠাৎ করে কেউ যদি রাস্তায়, বাসে বা ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে পরে যান তাহলে প্রথমে যেটা মাথায় রাখবেন তা হল, তাঁকে কখনোই তুলে বসানোর চেষ্টা করতে যাবেন না। তাঁকে শুইয়ে রেখেই তার পা দু-টো শরীরের লেভেলের উপরে তুলে রাখবেন। অনেকক্ষণ রাখার জন্য একটা উঁচু ব্যাগের উপরে পা দুটো তুলে রাখুন। রোগীর চারপাশে ভিড় না করে কিছুটা বাতাস আসতে দিন। হাতের নাড়ি (pulse) দেখতে জানলে নাড়ির গতি দেখুন। যদি তা মিনিটে ৬০-এর চেয়ে বেশি থাকে তাহলে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। তবে গতি যদি তারও কম হয় বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে শীঘ্রই রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া উচিত। চোখে জলের ঝাপটা দিতে পারেন। দেখবেন আস্তে আস্তে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে। তবে জ্ঞান ফিরে আসা মাত্রই রোগী যদি উঠে দাঁড়াতে চান তবে তাঁকে বাধা দিন। উঠে দাঁড়ালে তিনি আবার সিনকোপে আক্রান্ত হতে পারেন। বেশ কিছুক্ষণ, ৫ থেকে ১০ মিনিট, পা তুলে শুইয়ে রাখলে রোগী যদি সুস্থ বোধ করেন তাহলে তাঁকে ধীরে ধীরে দাঁড়াতে সাহায্য করুন। দাঁড়াতে গিয়ে যদি আবার একই সমস্যা রোগী বোধ করেন, তাহলে পুনরায় তাঁকে পা তুলে শুইয়ে দিন।

প্রতিরোধ নিয়ে কিছু কথা

গরমকালে জল বেশি খাবেন। রাস্তায় কড়া রৌদ্রে বেরোলে, অনেকখানি জল খেয়ে বেরোবেন; আর একটা জলের বোতল সঙ্গে রাখুন। নুন আর চিনি জলে গুলে রাখলে আরও ভালো হয়, কারণ আমাদের ঘামের মধ্যে দিয়ে জল ছাড়া বেশ কিছু অত্যাবশ্যক মিনেরালও বেড়িয়ে যায়। যাত্রাপথে ভিড় বাসে বা ট্রেনে যদি একেবারেই নড়াচড়া না করতে পারেন তাহলে পায়ের আঙুলগুলো নাড়ানোর চেষ্টা করুন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি গোড়ালি নাড়াতে পারেন। তাতে রক্ত-চলাচল সবচেয়ে ভালো হয় কারম গোড়ালি নাড়ানোর জন্য যে পেশিটা দায়ী সেটাই পায়ের রক্তের সঞ্চলনে বড়ো ভূমিকা পালন করে। যাদের রক্তচাপ বেশি ও তার জন্য ওষুধ খান, তাদের উচিত গরমকালে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের মাত্রাটা ঠিক করে নেওয়া। কারণ গরমের অতিরিক্ত ঘামের ফলে রক্তচাপ কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় যে কারণে ওষুধের ডোজ কমানোর প্রয়োজন হলেও হতে পারে।

খাদ্যবিষয়ক কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার

খাদ্য আর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ধারণার বিভিন্নতা আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ করে থাকি। মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তার নানান ভ্রান্ত ধারণাও এই বিভিন্নতার জন্ম দিয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই খাদ্যাভ্যাসের উপর ধর্ম, অঞ্চল, দেশ, জনজাতি ইত্যাদির প্রভাব দেখেই থাকি। তবে খাদ্য গ্রহণের এই বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা (পরিমাণ ও গুণ দুই অর্থেই) কোনো মজার গল্প নয়, এর সঙ্গে জুড়ে আছে সামাজিক ও জৈবিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভারতে আজও মহিলাদের ৮০% রক্তাল্পতার শিকার, ভারতের সমস্ত বস্তি এলাকার সিংহভাগ মানুষ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন, এরকম নানা খাদ্যজনিত সমস্যায় আমরা আজও জড়িয়ে আছি। তবে অপ্রাপ্তির এই ঘটনার পাশাপাশি সমান্তরালে ঘটে চলেছে প্রয়োজনাতিরিক্ত এক নিত্যনতুন নির্মাণ। যেখানে জাঙ্ক ফুড (Junk food)

আর ফাস্ট ফুডের (Fast food) রমরমায় বাজার ভরে চলেছে। পরম্পরাকে ভেঙে তৈরি হচ্ছে এক অজানা আর অচেনা পরম্পরা। বিজ্ঞাপনের দৌলতে দ্রুতবেগেই মানুষের জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে চলেছে এই ''নিও-ফুড হ্যাবিট''। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাপ্তির মধ্যে কিন্তু আছে নানা ধরনের ভ্রান্তিবিলাস যা ঘটিয়ে চলেছে নিত্যনতুন রোগ-ব্যাধি। বর্তমান লেখার প্রেক্ষিতে আমরা মূলত মনোনিবেশ করব খাদ্য সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার উপর।

এই বিভিন্নতা ও ভ্রান্ত ধারণা নির্মাণের পিছনে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রভাবকে চিহ্নিত করতে পারি—

১। ধর্মীয় কারণ

ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে অনেক খাদ্যাভ্যাসই যে তৈরি হয় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যেমন ইসলাম ধর্মে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ তবে গোমাংস মূল খাদ্যের অন্যতম। হিন্দু ধর্মে আবার এই গোমাংস ভক্ষণ মহাপাপের সমতুল্য। জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মূলত নিরামিষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন। ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই খাদ্যাভ্যাস কিন্তু কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। খাদ্যের পুষ্টিগুণ যতই ভালো হোক না কেন বিশ্বাসের এই বাঁধ বা বাধাকে কিন্তু আজও ভাঙা যায়নি।

২। সামাজিক কারণ

ভ্রান্তি বা বিভিন্নতার এক বড়ো কারণ অবশ্যই লুকিয়ে আছে সামাজিক বিভিন্ন প্রচার ও আলোচনার মধ্যে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া এমনকী তথাকথিত দক্ষ মানুষের বয়ানের নানা ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য সমাজে ভ্রান্তধারণা আর বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

৩। প্রচলিত বিশ্বাসের প্রভাব

গর্ভাবস্থায় পাকা পেঁপে, আনারস বা ভাজা মাংস খেলে গর্ভপাত হতে পারে; অধিক পরিমাণে বিট খেলে শরীরে রক্তের পরিমাণ চড়চড় করে বাড়ে; গর্ভাবস্থায় ঝিনুক, কাঁকড়া বা শামুক খেলে সদ্যোজাত বাচ্চার মাথায় আঁশ দেখা যায়; মাছ-মাংস একসঙ্গে খেলে কুষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়; এরূপ বিভিন্ন প্রচলিত ধারণায় আজও আমাদের সমাজ জর্জরিত।

৪। অর্থনৈতিক কারণ

মজুরির হ্রাস, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, পরিষ্কার জলের অভাব ইত্যাদি কারণে খাদ্য ও পুষ্টির এক বড়ো ঘাটতি দেখা যায়। বস্তি অঞ্চলে ঘর বা রান্নাঘরের ক্ষুদ্রতার কারণে আর পাশাপাশি রান্নার সময়াভাবের কারণে রন্ধন-প্রক্রিয়ার অনেকটাই ব্যাহত হয়। সঠিক পরিকাঠামোর অনুপস্থিতির দরুন দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের পেটের সমস্যা আর পুষ্টির অভাব।

৫। খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষা

খাদ্য সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থান নিরপেক্ষভাবেই বর্তমান। সঠিক তথ্য আর পুষ্টিগুণের ব্যাপারে ভুল বা অসম্পূর্ণ জানা-বোঝার ফলেও আমরা ভ্রান্ত ধারণার প্রসার লক্ষ করে থাকি।

এবার আমরা বিশেষ কিছু খাদ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা আর কুসংস্কারের আলোচনাতে ঢুকে যাব।

১। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):

ছানা এবং চিজ প্রধানত প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং আংশিকভাবে ফ্যাটমুক্ত খাদ্যবস্তু।

প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): গোরুর দুধের তৈরি ছানায় ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন আছে আর ২০.৮ গ্রাম ফ্যাট আছে। চিজে ২৪.১ গ্রাম প্রোটিন আর ২৫.১ গ্রাম ফ্যাট আছে।

২। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):

ডিম খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়।

প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): মার্কিন কৃষি বিভাগের মত অনুযায়ী একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৩০০ মিলিগ্রাম অবধি কোলেস্টেরল খাওয়া যেতে পারে। একটা প্রমাণ মাপের ডিমে সর্বাধিক ১৮৬ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। কিন্তু যারা ডায়াবেটিক অথবা যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০০ মিলিগ্রামের বেশি খাওয়া উচিত না।

৩। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):

শালদুধ (colostrum), শিশুর জন্মের পরেই মায়ের বুক থেকে প্রথম যে গাঢ় হলুদ দুধটা নিঃসৃত হয়, তা শিশুকে খাওয়ানো উচিত না।

প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): শালদুধে প্রচুর পরিমাণে IgA প্রতিষেধক ও শ্বেতরক্তকণিকা থাকে। তাই সদ্যোজাত শিশুকে শালদুধ খাওয়ালে তার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় যার ফলে সে অনেক রোগ-ব্যাধি ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সদ্যোজাত শিশুকে তাই শালদুধ খাওয়ানো অতি আবশ্যক।

৪। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):

বাদাম খেলে মোটা হয়ে যায়। তাই weight reduction diet-এ বাদাম বাদ দেওয়া উচিত।

প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): যদিও বাদাম প্রথম শ্রেণির ক্যালোরি ও ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্যবস্তু, বাদামে কিন্তু অধিক পরিমাণে MUFA বা মোনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা রক্তের glycaemic index-কে কমিয়ে দেয়। ফলত রক্তে শর্করার পরিমাণ বজায় থাকে। এ ছাড়া বাদামে প্রোটিন, ফাইবার এবং অনেক ভিটামিন ও খনিজদ্রব্য থাকে যা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়।

৫। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):

সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য ফ্যাট যুক্ত খাওয়ার বর্জন করা উচিত।

প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): মানবদেহে ফ্যাটের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা আছে। ফ্যাট খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু আর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কোলেস্টেরল উৎপাদনে ফ্যাট সাহায্য করে। ভিটামিন A, D, E, K এই চারটি শুধুমাত্র ফ্যাটেই দ্রবীভূত হতে পারে। তাই ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমেই এই ভিটামিনগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শরীর কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদন করতে পারলেও অনেকগুলো আবার সে করতে পারে না, যা পাওয়ার জন্যে আমাদের ফ্যাট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৬। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):
রান্না করা সবজির তুলনায় কাঁচা সবজি খাওয়া ভালো।
প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): রান্না করার সময় সবজির বাইরের শক্ত আবরণীটা ভেঙে যায়, ফলে তা সহজপাচ্য হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সবজি একসঙ্গে রান্না করলে সেই খাদ্যে Anti-oxidant-এর সমৃদ্ধি বেড়ে যায়। এমনকী খাদ্যের শোষণ পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

৭। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):
মাখন (butter)-এর থেকে মার্জারিন (margarine) খাওয়া অনেক বেশি উপকারী।
প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): দু-টোতেই সমপরিমাণ ফ্যাট এবং ক্যালোরি থাকে। মাখনে saturated fat থাকে যা আমাদের শরীরে LDL-C বা Bad Cholesterol এবং HDL-C বা Good Cholesterol-এর পরিমাণ সমানভাবে বাড়ায়। অপরদিকে মার্জারিনে প্রচুর পরিমাণে transfat থাকে যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। মার্জারিন খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণকে রক্তে বাড়িয়ে দেয়, এমনকী HDL-C বা ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণকে অধিক মাত্রায় কমিয়ে দেয়। মাখন আর মার্জারিন উভয়েই Bad Cholesterol-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেও মার্জারিন একই সঙ্গে Good Cholesterol-এর পরিমাণকে কমিয়েও দেয়। তাই মাখনের থেকে মার্জারিন বেশি ক্ষতিকর।

৮। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):
চকোলেট ওজন বৃদ্ধির কারণ।
প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): National Institute of Health-এর মতে সপ্তাহে পাঁচদিন অল্প পরিমাণে চকোলেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। এটা BMI (Body Mass Index) কমাতে সাহায্য করে।

৯। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):
কফি খাওয়া স্বাস্থের পক্ষে ভালো না।
প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): কফিতে ক্যাফিন নামক একটি উত্তেজক উপাদান থাকে, যেটা মস্তিষ্ককে সতেজ করে তোলে। এ ছাড়া কফিতে সামান্য পরিমাণে খনিজ লবণ আর প্রচুর পরিমাণ Anti-oxidant থাকে যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

১০। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস (মিথ):
আলু পাউরুটি, পাস্তা, ভাত প্রভৃতি শর্করা যুক্ত খাদ্য খেলে মোটা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
প্রকৃত সত্য (ফ্যাক্ট): এখনও অবধি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে শর্করাযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ওজন বৃদ্ধি হতে পারে। ওজন বৃদ্ধি তখনই হয় যদি শরীরের প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করা হয়।

উপরিল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণা ছাড়াও আরও অনেক কল্পিত বিশ্বাস ও ধারণা আমাদের সমাজে জোরালোভাবে টিকে আছে যেমন—

- রসুন উচ্চরক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে রান্না করা খাবার ক্যানসারের কারণ।
- দুধের সঙ্গে কমলালেবু বা মাছ খাওয়া ক্ষতিকারক।
- স্থূলতা কমানোর অন্যতম উপায় হল প্রাতরাশ না করা।
- মধু খেলে মোটা হয় না।
- মাংস খেলেই শারীরিক ক্ষমতা বাড়ে।
- ফলের রস থেকে ক্যালোরি পাওয়া যায় না।
- পাউরুটির থেকে টোস্টে কম ক্যালোরি থাকে।
- উদ্ভিদজাত তেল যেমন খুশি খওয়া যেতে পারে। তাতে নাকি ওজন বৃদ্ধি হয় না।

খাদ্য-সম্পর্কিত এই সমস্ত ধারণা বা কুসংস্কারের অন্যতম ফল হল বেঠিক পুষ্টি (অপুষ্টি বা অতিপুষ্টি)। শিশু থেকে বয়স্ক অধিকতর মানুষ অপুষ্টির শিকার হন খাদ্যাভ্যাসের ত্রুটির জন্য এবং সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য না খাওয়ার জন্য। এইসব ভ্রান্তবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষাদান আর সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

Advt.

নতুন আলোকে অবাধ মার্কসবাদ চর্চার একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

(নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *মান্থলি রিভিয়ু*-র বাংলা সংস্করণ)

বর্তমান সংখ্যার বিষয়বস্তু
- ইন্টারনেটের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ
- ইলেকট্রনিক নজরদারির বিশ্বফাঁদ
- মার্কস ও বাস্তুতন্ত্র
- নারীবাদীর চোখে চে

প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ টাকা
যোগাযোগ: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

কী ওষুধ খাচ্ছেন জানুন:

ওমিপ্রাজোল (Omeprazole)

এই ওষুধকে বলা হয় 'প্রোটন পাম্প' ইনহিবিটর।

এ ওষুধ কেন ব্যবহার করা হয়?

- প্রধান ব্যবহার পেপটিক আলসার অর্থাৎ পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের ঘা সারাতে।

এ ছাড়া

- গ্যাস্ট্রো-ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স সিন্ড্রোমে, যেখানে পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড খাদ্যনালিতে উঠে এসে বুকজ্বালা ঘটায়,
- জলিঙ্গার এলিসন সিনড্রোম,
- এইচ. পাইলরি জীবাণুকে মারতে অ্যামক্সিসিলিন ও মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজোলের সঙ্গে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

কীভাবে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়?

মুখে খাবার ক্যাপসুল হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়, ১০ মিলিগ্রাম ও ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল হিসেবে পাওয়া যায়। দিনে সাধারণত একবার খেতে হয়। খাবার আগে ওষুধ খেতে হয়।

ওষুধ ব্যবহারের সময় কী কী সাবধানতা নিতে হবে?

- ওমিপ্রাজোল বা অন্য কোনো ওষুধে আপনার অ্যালার্জি আছে কিনা ডাক্তারকে বলুন।
- আর কী কী ওষুধ খাচ্ছেন তাও ডাক্তারকে জানান, ওষুধগুলোর মাত্রা বদলাতে হতে পারে।
- আপনার লিভারের অসুখ আছে কিনা, আগে কখনো হয়েছিল কিনা ডাক্তারকে জানান।
- আপনার পেটে বাচ্চা আছে কিনা, বাচ্চা চাইছেন কিনা বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন কিনা জানান। ওষুধ চলাকালীন যদি দেখেন যে, মাসিক বন্ধ হয়েছে ডাক্তারকে বলুন।

খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া চালাতে পারবেন।

ওষুধের একটা মাত্রা খেতে ভুলে গেলে কী করবেন?

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাটা খেয়ে নিন। যদি পরের মাত্রার সময় প্রায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভুলে যাওয়া মাত্রা খাওয়ার দরকার নেই। দ্বিগুণ মাত্রায় ওষুধ খাবেন না।

এ ওষুধে কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে?

- পেটে ব্যথা
- পাতলা পায়খানা
- ঝিমুনি
- চামড়ায় অল্প ফুসকুড়ি
- কষা পায়খানা
- কাশি

গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কি না?

গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে নিরাপত্তার তথ্য নেই। ব্যবহার না করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কি না?

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে নিরাপত্তার তথ্য নেই। ব্যবহার না করা উচিত।

ওষুধ কীভাবে রাখতে হবে?

বেশি গরম ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখবেন না। একটা কৌটোয় বন্ধ করে রাখলে ভালো।

ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে:

➢ বিভ্রান্তি, ➢ ঝিমুনি ভাব, ➢ দেখতে অসুবিধা, ➢ বুক ধড়ফড়, ➢ পেট খারাপ, ➢ বমি, ➢ ঘাম দেওয়া, ➢ গরম ভাব, ➢ মাথা ব্যথা, ➢ মুখ শুকিয়ে যাওয়া হতে পারে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

● বাণিজ্যিক নয়— চিকিৎসা হোক মানবিক

কিছু মনে করবেন না স্যার

মনীষা আদক

এক দাদাকে দেখতে সেদিন এক সরকারি হাসাপাতালে গেছি। হঠাৎ শুরু হল এক আর্ত চিৎকার 'ও বনোয়ারী রে . . .' সামনের ফাঁকা জায়গায় মাটিতে শুয়ে পড়েছেন মহিলা, পরমুহূর্তেই ছুটে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করছেন—ওই বুকফাটা চিৎকার আজও চোখ বুজলে শুনতে পাই। আত্মীয়স্বজনরা চেপে ধরে আছেন সন্তান হারানো মা-কে। আবছা হয়ে গেছে আমারও চোখ, মনে হচ্ছে ছুটে পালিয়ে যাই। ধীর পায়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানলাম—হোমিওপ্যাথ, অ্যালোপ্যাথ মিলিয়ে চারজন ডাক্তারের হাত ঘুরে আজ তার জীবন শেষ হল হাসপাতালে। সকলেই অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়েছেন। বলেছেন আগের রিপোর্ট চলবে না। নতুন করে নতুন জায়গা থেকে করতে হবে। তারপর তাঁরা আলাদা আলাদা ওষুধ দিয়েছেন। শেষ সম্বলের বিনিময়ে মা তাঁদের সব নির্দেশ পালন করেও আজ শোকেতাপে পথের ধুলোয়।

প্রশ্নটা এখানেই—এক তো ডাক্তারখানায় গেলে মনে হয়, আসল কাজ বিভিন্নরকম টেস্ট করা। এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থেকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাকি অন্যান্য সেন্টারগুলোতে কি ভুল রিপোর্ট দেওয়া হয়? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে ওই সেন্টারগুলো কি তাহলে ঘুষ দিয়ে লাইসেন্স পেয়েছে? নাকি ডাক্তারবাবুর বিশেষ অসুবিধা হবে তার পছন্দের অথবা প্রাপ্তির কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা না করালে? এত এত পরীক্ষা করার পর অনেক সময় হয়তো দেখা গেল কিছুই পাওয়া গেল না। তখন মনে হয় মাননীয় ডাক্তারবাবু সরকারি পয়সায় এত পড়াশোনা করার পর কিছুই বুঝতে না পেরে এত অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করান কেন? কিছু মনে করবেন না—আপনারা আমাদের ভগবান, রক্ষাকর্তা----কিন্তু এরকম প্রবাদও আছে 'রক্ষকই ভক্ষক'—তাই প্রশ্ন করতে হয়।

সেদিন আমার এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল—সে বলল, 'একজন ডাক্তারকে গাড়ি পাঠাতে হবে।' আমি বললাম, 'মানে?' সে বলল, 'ওনার ড্রাইভার নেই তাই ৭ দিনের জন্য গাড়ি চাইছেন একটা। খরচ আমাদের।' হাসি পেয়ে গেল কারণ সেই ডাক্তার কত লক্ষ টাকা রোজগার করেন তা ভাবা যায় না। বিদেশভ্রমণ থেকে বিশেষ উপহার, সবরকম উৎকোচ গ্রহণ করে প্রেসক্রিপশন লেখার সময় রোগীর কথা চিন্তা করবেন না কি সেই ওষুধ কোম্পানির কথা? ভাবলে ভয় হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার কমই থাকেন, হাসপাতালে বেড পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অথচ প্রাণ যায় যায়—কী আর করা, ঘটিবাটি বেচে শেষ সম্বলটুকু পকেটে নিয়ে গজিয়ে ওঠা নতুন অথবা হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপন দেখে বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে দৌড়ানো। বেশিরভাগ জায়গাতেই পেশেন্ট পার্টি চা খায় আর অপেক্ষা করে কখন রিসেপশন থেকে বলবে 'বেড নং অমুক, ক্যাশে তমুক টাকা পেমেন্ট করুন'—কীসের, কেন এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকে না বেশিরভাগ সময়েই। অবস্থাপন্ন লোকেরা তাও মেডিক্লেইম থেকে কিছু পায়। গরিব মানুষ তো জানেই না, সেটা খায় না মাথায় দেয়। একে তো প্রিমিয়াম যে জায়গায় পৌঁছেছে তা দিতে গেলে গরিব মানুষ চিকিৎসার আগেই মারা পড়বেন। তার ওপর কীভাবে তা করতে হয়, মেডিক্লেইম পেতে হয় এসব জানানোর দায়িত্ব কেউই নেননি। শুনেছি জন্মতারিখ সাঁটা প্যানকার্ড ইত্যাদি লাগে। হায়রে আমার দেশ! চল্লিশোর্ধ্ব ক-টা মানুষের আছে সে সব? সুতরাং এসে যায় সেই ঘটিবাটি বেচা অথবা মৃত্যু।

আমাদের দেশে দেখবেন বিপদে পড়লে আপনাকে সাহায্য সহানুভূতির বদলে দুর্ব্যবহার বা হয়রানি পেতে হবে। বেশি রাতে বা দুর্যোগে আপনি যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই ট্যাক্সি বা রিকশা আপনার থেকে বেশি টাকা চাইবে। ডাক্তারের কাছে আপনি যখন একরাশ ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে প্রায় জমিদারের চাকরের মতো হয়ে উঠবেন—তখন তিনি আপনাকে একটা সমবেদনার কথা, আশার কথা, ভরসার কথা বলতে পারবেন না। অকারণে ভয়ানক ক্ষেপে যেতেও পারেন। তাই বেশিরভাগ লোক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্য বিশেষ এক্সপার্ট কোনো আত্মীয় বা বন্ধুকে নিয়ে যায়। আপনাদের আমরা এত ভয় পাই কেন বলুন তো, আমরা তো অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করেও ফেলতে পারি, ডাক্তারি তো পড়িনি, একটু ভালো করে কথা বললে যদি অসুস্থ সন্তানের দরিদ্র পিতা একটু ভরসা পায়, ডাক্তারবাবুর কি খুব অসুবিধা হয়?

> যে অপারেশনটা আমার হবে সেটা আমার এখনই প্রয়োজন ছিল তো? নাকি ডাক্তারবাবুর প্রয়োজনে?

মাঝেমাঝে মনে হয়, এরকমও তো হতে পারে ২০ বছর প্রচুর টাকা রোজগার করার পর কোনো ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন বাকি জীবনটা ফি কমিয়ে দেবেন—৫০০ টাকা থেকে ৫০ টাকা করে দেবেন। এরকম উদাহরণ পাই না— ওটা বাড়তেই থাকে, কমে না, তাও আমরা চেম্বারের বাইরে লাইন দিই ভোর থেকে অথবা লোক ধরি একটা ডেট পেতে। কী করব, রোগযন্ত্রণা বড়ো বালাই। শুনেছি ডাক্তারবাবুদেরও অনেক সমস্যা আছে। নার্সিং হোম সংশ্লিষ্ট-ডাক্তার রোগী ভর্তির কোটা পূরণ না করতে পারলে, মাইনে কমে যেতে পারে, চাকরি চলে যেতেও পারে। খুব সমস্যা। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার না করলে ডাক্তারবাবুদের তো আবার মান থাকে না। ভয় হয়—যে অপারেশনটা আমার হবে সেটা আমার এখনই প্রয়োজন ছিল তো? নাকি ডাক্তারবাবুর প্রয়োজনে?

হয়তো অনধিকার দাবি করে ফেলি পৃথিবীতে আমাদের ভগবানদের কাছে। তবু আশা ছাড়তে ইচ্ছা করে না পালটাবে এ ব্যবস্থা। এ রুচি, এ চাহিদা আর বিশ্বাস করি এই মানসিকতার বাইরে আছেন অসংখ্য সত্যি ভগবান ডাক্তারবাবু নাহলে আমরা সবাই মারা যেতাম। তাই এসব কথা তাদের গায়ে লাগবে না। বাকিরা ক্রুদ্ধ হলে আমার কিছু যায় আসে না।

| লেখক শিক্ষিকা ও নাট্যকর্মী। |

দুর্নীতিমুক্ত ডাক্তার—একটা খোঁজ

দুর্নীতি এক গভীর ও ব্যাপক সামাজিক সমস্যা। ডাক্তাররাও সামাজিক জীব, সেকারণে তাঁরাও এই সমস্যায় জড়িয়ে যান। আলাদা করে তাঁদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলে শোরগোল তুলে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না। গোটা সমাজের 'দুর্নীতিমুক্তির' আন্দোলনে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেও জড়িয়ে নিতে হবে। বিশ্বের নানা দেশের নজির তুলে কীভাবে আমাদের দেশেও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একটা বড়োসড়ো বদল আনা যায়; কীভাবে সমাজের মানুষজনের তথা ডাক্তারদের নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো যায়—যা পরিণতিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতিরোধে একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে—এই নিবন্ধে তার হদিশ দিয়েছেন **ডা. সুমিত দাশ**।

এই পৃথিবীতে সবথেকে কঠিন কাজ বোধহয় সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বিষয়ে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। 'দুর্নীতি'র সংজ্ঞা নির্ধারণেও একই সমস্যা। এরকম কি ভাবা যায়—কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার বা তাদের উপর নির্ভরশীল মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত করে যাতে নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে লাভবান হয় তবে তাকে দুর্নীতি বলে। কাজ চালানো গোছের এই সংজ্ঞাটি মাথায় রেখে এগোনো যাক। এই পৃথিবীতে একটা সংস্থা আছে যার নাম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (Transperancy International)। এরা বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি মাপে। এদের মাপার পদ্ধতিও যথারীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় কিন্তু দুর্নীতি পরিমাপে এরাই সব থেকে স্বীকৃত সংস্থা। তালিকাটি কম থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বিস্তৃত। এই তালিকায় সবার উপর দিকে থাকে নিউজিল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি। আর সাধুসন্তদের ঐতিহ্যবাহী 'মহান' দেশ ভারতবর্ষের স্থান পঁচাশিতম! আরও কতগুলি তথ্য দিই। ৬২ শতাংশ ভারতীয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ দিয়েছে। সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগগুলি হচ্ছে সরকারি সার্ভিস বিভাগ, পরিবহণ, রিয়্যাল এস্টেট এবং কনস্ট্রাকশান, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন প্রোগ্রাম। এ ছাড়া টেলিকমিউনিকেশন, পুলিশ ইত্যাদি তো আছেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় নাগরিকরা দুর্নীতির এক নাগপাশে আষ্টেপৃষ্টে আটকে আছে। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া 'জিনে'র থেকেও বড়ো ভূমিকা নেয় তার পরিবেশ তার সমাজ। এরকম একটা সামগ্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ থেকে কী করে আশা করা যায় কেবলমাত্র ডাক্তাররা সৎ, দুর্নীতিমুক্ত চরিত্র হিসাবে উঠে আসবে! তাহলে কি দুর্নীতিমুক্ত ডাক্তার একটা অবাস্তব চরিত্র। গল্পে, উপন্যাসে, সিনেমার সেই দরদি ডাক্তাররা শুধু কি কল্পনার জগতেই শোভা পায়। দেখা যাক তাকে খোঁজার কোনো রাস্তা পাওয়া যায় কিনা।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বাস্থ্য রক্ষা

যেহেতু একজন ডাক্তার সেই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশ তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে শুধুই ব্যক্তি ডাক্তারকে টার্গেট করে কোনো লাভ হবে না। তাই দুর্নীতিমুক্তির জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও তাতে সম্পৃক্ত ডাক্তার উভয়কে লক্ষ্য করেই এগোতে হবে। এক্ষেত্রে মোটামুটি দু-টি শর্তকে মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে আর্থিক লেনদেনে ডাক্তারের ভূমিকা বিশেষ থাকবে না। দ্বিতীয়ত নৈতিকতায় উত্তরণ।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা কী বলে, রোগী ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গেলে রোগীকে ডাক্তারবাবু ক্লিনিক্যালি পরীক্ষানিরীক্ষা করে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। সেখানে কিছু ওষুধ লেখেন এবং ল্যাবরেটরি থেকে কিছু পরীক্ষার কথা বলেন। এরপর তিনি তার ফিস নেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাতে রোগীর কোনো ভূমিকা নেই। ডাক্তারবাবু কত ফিস নেবেন সেটা তিনি ঠিক করেন, কোন ব্র্যান্ডের ওষুধ খেতে হবে সেটাও তিনি ঠিক করেন (হয়তো একই ওষুধ কম দামে অন্য নামে পাওয়া যায় তা সত্ত্বেও), পরীক্ষাগুলি কতটা প্রয়োজনীয় সেটা ডাক্তারবাবু ঠিক করেন, এমনকী অনেক ক্ষেত্রেই কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করতে হবে সেটাও ডাক্তারবাবুই ঠিক করেন। এবং রোগী দেখার এই প্রত্যেকটা ধাপেই নিজের যথেচ্ছ ফিস নেওয়ার বাইরেও, ঘুরপথে পকেট ভরানোর সুযোগ থাকে।

কিন্তু যদি সিস্টেমটা বদলে এরকম করা যায়। রোগী অসুস্থ হলে তার এলাকার কোন ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন আগে থেকেই ঠিক করা আছে। কোন সমস্যায় কী ওষুধ লিখবেন সেটা করবেন প্রামাণ্য বিধি মেনেই। কী পরীক্ষা করাবেন সেটাও চিকিৎসার নির্দেশিকা মেনে যেটা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠানো হবে সেটাও ঠিক করা আছে। হাসপাতালে ভর্তি থেকে যেকোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে প্রয়োজনে—এবং সবকিছু বিনামূল্যে! নাগরিকদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে সরকার। কল্পনা মনে হচ্ছে। তা নয়—ঘোর বাস্তব। এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বলা হয় Universal Health Care বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা। অর্থাৎ সরকার তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীরা তাদের প্রাপ্য অর্থ পাবে সরকার থেকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে বসে এই রকম একটা সিস্টেম হয়তো স্বপ্নেও ভাবা যায় না কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশে সরকার তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নিজে নিয়েছে। নিউজিল্যান্ড হচ্ছে প্রথম দেশ যে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে এই পরিষেবা সম্পূর্ণ করে। তারপর জার্মানি (১৯৭১), বেলজিয়াম (১৯৯৫), ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (১৯৪৮) করে, এরপর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেন (১৯৫৫) ও নরওয়ে (১৯৫৬) এই ব্যবস্থা লাগু করে। ধীরে ধীরে কানাডা, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এমনকী প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কাও এই পথে হেঁটেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবের পরে রাশিয়া, চীন ও কিউবার কথা। রাশিয়া ১৯৩৭ সালে সবার জন্যে স্বাস্থ্য লাগু করলেও গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ পর্যন্ত এর সুফল পৌঁছোতে লাগে ১৯৬৯ সাল। চীন ১৯৫০ সালে এই প্রোগ্রাম শুরু করে। কিউবা ১৯৬০ সালে। এই দেশগুলির কথা আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে বিপ্লবপূর্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ওই সব দেশে খুব খারাপ ছিল। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা এবং সঠিক স্বাস্থ্যনীতি এসব দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছে।

এবার আমাদের দেশের দিকে একবার তাকানো যাক। ২০১০ সালে ভারতের যোজনা কমিশন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে। তার প্রধান ছিলেন ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি। ২০১১ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে এই কমিশনের করা কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরছি।

- স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় তৎকালীন জি.ডি.পি-র ১.৪ % থেকে বাড়িয়ে ২০১৭-র মধ্যে অন্তত ২.৫% এবং ২০২২-এর মধ্যে ৩% করতে হবে।
- সরকার নিজে ওষুধ কিনে সকলকে বিতরণ করুক।
- স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ইউজার 'ফি'র বিরোধিতা করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিমার বিরুদ্ধে সুপারিশ করা হয়।

বলাই বাহুল্য দ্বাদশ যোজনা কমিশনে এই সুপারিশগুলি মানা হয়নি। উলটে সুপারিশগুলি এমন করা হয় যে স্বাস্থ্যকে বেসরকারিকরণের দিকে ঝোঁক বেশি। এটা ছিল পূর্বতন ইউ. পি. এ. সরকারের সময়ের কথা। বর্তমান মোদি সরকার এসে প্রথমেই স্বাস্থ্যখাতে ২০% বরাদ্দ কমিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা কমেছে। যদিও তাদের প্রস্তাবে জি.ডি.পি-র ২.৫% খরচ করার কথা এবং আরও কিছু গালভরা কথা আছে কিন্তু ঝোঁকটা সেই বেসরকারিকরণের দিকে। অর্থাৎ ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ রয়েই যাবে।

সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলে অর্থের জোগান কী করে হবে। এই প্রশ্নটা সাধারণ মানুষ থেকে মন্ত্রী আমলা সবাই করেন। এখন দেখা যাক যে সমস্ত দেশ ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার প্রোগ্রাম নিয়েছে তারা কী করে চালায়। এর কয়েকটি মডেল আছে। সংক্ষেপে দু-টি বলা হল।

১। বিভেরিজ মডেল

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বলে National Health Service সংক্ষেপে NHS। তারা এই মডেল অনুসরণ করে। এর প্রবক্তা William Biveridge-এর নাম অনুসারে এর নাম হচ্ছে বিভেরিজ মডেল। এখানে নাগরিকের দেওয়া করের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হয়। ডাক্তার ও কর্মচারী সরকার থেকে মাইনে পান। প্রাইভেট ডাক্তার আছেন—তারাও ফি পান সরকার থেকে। যেহেতু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক সরকার তাই খরচ খুব কম। গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও অধিকাংশ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি, স্পেন, হংকং, কিউবাতে এই মডেল চালু আছে।

২। বিসমার্ক মডেল

অটো ভন বিসমার্কের নামে এই মডেল। স্বাস্থ্য পরিষেবা চলে বিমার মাধ্যমে। বিমা কোম্পানিগুলোকে বলে sickness fund। কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা দু-জনেরই মাইনে থেকে টাকা কাটা হয়। সবাই থাকে বিমার আওতায়। সরকারের কড়া নজরদারিতে থাকার জন্যে খরচ অনেক কম হয়। জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জাপান প্রভৃতি দেশে এই মডেল চালু আছে।

কিছু কিছু দেশে এই দুই মডেলের মিশ্ররূপ চালু আছে। এখন প্রশ্ন হল মডেল চালু হলেই কি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে? ডাক্তাররা সব সততার প্রতীক হয়ে যাবেন? সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেই কি সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাবে? এখানেই বড়ো হয়ে ওঠে দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ নৈতিকতার প্রয়োজন।

নৈতিকতা নির্মাণ

প্রথমে দু-টি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ২০১০ সালে NRHM বা National Rural Health Mission-এর মাধ্যমে ৮৬৫৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়। ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে CBI অনুসন্ধান করা হয়। তারা দেখায় মোট ৫৭৬৪ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকেরও বেশি টাকা চুরি হয়। মূলত রাজনৈতিক নেতা, মাফিয়া, প্রমোটার চক্র এতে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু যেহেতু যেকোনো হেলথ প্রজেক্টে ডিস্ট্রিক্ট CMO-র (Chief Medical Officer) একটা বিরাট ভূমিকা থাকে তাই বলাই বাহুল্য অনেক ডাক্তারই এই ঘটনায় জড়িত ছিল।

২০০৫ সালে ভারতবর্ষে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে Schedule Y of Drug and Cosmetic Act-এর শর্তগুলি কিছু শিথিল করা হয়েছিল। যেহেতু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছাড়া কখনোই ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণার উন্নতি হতে পারে না তাই এটার হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের অশিক্ষিত, গরিব মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে খরচ কমানোর জন্যে যেভাবে ট্রায়ালগুলি করা হয় সেখানে রোগীর নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ফলশ্রুতি ২০০৫ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে শুধু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্যে আমাদের দেশে ২৯০০ মানুষের মৃত্যু হয়। এখানেও মৃত্যু যজ্ঞের হোতা রাজনৈতিক নেতা, ওষুধ কোম্পানি ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্ত আবার সেই বলাই বাহুল্য ডাক্তার ছাড়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হতে পারে না তাই তারাও এই 'পাপের' ভাগীদার।

এই দু-টি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল কারণ এখানে ডাক্তাররা মূলত সরকার থেকে মাইনে প্রাপ্ত ডাক্তার, রোগীর সঙ্গে সরাসরি আর্থিক লেনদেনের সুযোগ নেই। কিন্তু তাতেও তাদের দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। আর এখানেই বড়ো হয়ে ওঠে নৈতিকতার প্রশ্ন।

যেকোনো কাজেই নৈতিকতা না থাকলে একজন মানুষ কখনো তার যথাযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। আবার একজন মানুষ এককভাবে ভালো থাকতে পারেন না যদি না তার পারিপার্শ্বিক সকলে ভালো হন। একজন মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্ষুদ্রতম একক তার বাড়ির পরিবেশ হলে সেখান থেকে ক্রমবর্ধমান রূপে পাড়ার পরিবেশ, গ্রাম বা শহরের পরিবেশ থেকে বৃহত্তম অর্থে দেশের সামগ্রিক পরিবেশকে বোঝায়। আর একজন শিশু জন্মের পর থেকে ছোটো থেকে বড়ো পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব তৈরি করে। তাই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশ একজন মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্তই তৈরি করবে—সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হোক আর মুটে মজুর হোক।

কিন্তু এই নৈতিকতা নির্মাণেও বড়ো ভূমিকা সরকারের। স্বচ্ছ প্রশাসন,

মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার, কর্মের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার দেওয়া সরকারের কাজ। অপরদিকে দায়িত্ব নাগরিক সমাজের। যেকোনো দুর্নীতি বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সুস্থ সমাজের জন্যে আন্দোলন করতে হবে।

পরিশেষে

এই লেখা যখন লিখছি, খবর পেলাম এলাহাবাদে ডা. রোহিত গুপ্ত নামে এক গ্যাস্ট্রোএনটারোলজিস্টকে আশি বছর বয়সি এক অ্যালকোহলিক সিরোসিস সঙ্গে কিডনি ফেলিয়োরের রোগীর মৃত্যুর জন্যে ভয়ংকর ভাবে মারা হয়েছে। সি.সি.টি.ভি.-তে তোলা সেই দৃশ্য যেকোনো সুস্থ মানুষের মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এটা কিন্তু কোনো নতুন ঘটনা নয়। রোগীর মৃত্যু এবং ডাক্তারের মার খাওয়া আশপাশে হরদম হচ্ছে, সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে অন্তত এই ধরনের মৃত্যুগুলির ক্ষেত্রে ডাক্তারের দোষ প্রায় থাকেই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর অসুস্থতা ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে ফেলে দেয়। কিন্তু একদিকে আছে ডাক্তারের প্রতি অবিশ্বাস অপরদিকে আছে জীবনের নানা দিকে অনিশ্চয়তার জন্যে মানুষের হতাশা। তাই রোগী মৃত্যুর মতো ঘটনাতে তাদের থেকে স্বচ্ছল থাকা ডাক্তারের উপর রাগের প্রকাশ হয় শারীরিক নির্যাতনে। এ ঘটনা থেকে মুক্তি পেতেও দরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

> কিন্তু এই নৈতিকতা নির্মাণেও বড়ো ভূমিকা সরকারের। স্বচ্ছ প্রশাসন, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার, কর্মের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার দেওয়া সরকারের কাজ।

দেখা গেল সারা পৃথিবীর ধনী, ততটা ধনী নয়, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বহু দেশই Universal Health Care-এর আওতায় এনেছে তার নাগরিকদের। এর জন্যে দরকার সরকারের সদিচ্ছা। কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নে কী করা যায়? এটা বিশ্বাস করা যাক না ডাক্তারি কোর্সে ঢোকা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে যেনতেন প্রকারে পয়সা উপার্জন। তাদের সামনে যদি তুলে ধরা যায় কোনোরকম দুর্নীতি না করেও যথেষ্ট স্বচ্ছল জীবনযাপন করা যায়। যদি তাদের বোঝানো যায় এই পেশা আর পাঁচটা পেশার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে জড়িয়ে আছে একজন মানুষের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা মুক্তির প্রশ্ন। আছে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন—যার মাঝে দাঁড়াতে পারে একজন ডাক্তারই। আর অসুস্থতার এই সময়গুলোতে মানুষ থাকে অসহায়। তাই তাদের অসহায়ত্বকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা অমানবিক। তাহলে মনে হয় বিবেকবান দরদি ডাক্তাররা সিনেমার পর্দা থেকে বাস্তবের মাটিতে আবার নেমে আসবে।

| ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার জন্য তৈরি একটা ক্লিনিকের সঙ্গে বহু বছর ধরে যুক্ত। |

If undelivered please return to

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

অ্যান্টিবায়োটিক ও তার অপব্যবহার

অ্যান্টিবায়োটিক কী এবং কেন তার ব্যবহার। কখন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করবেন। অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার, অপব্যবহার, অতিব্যবহার কীভাবে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে—এইসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন **ডা. মানস দাস।**

নিবারণবাবুর জ্বর হল ক-দিন আগে। পাড়ার দোকান থেকে বলে ওষুধ নিয়ে এলেন। চারটে অ্যামোক্সিসিলিন ক্যাপস্যুল এবং প্যারাসিটামল। ক-দিন পরে কাশি হল। ওষুধের দোকানে বলে একটা কাফ সিরাপ আনালেন। এমন জ্বর-কাশি মাঝে মধ্যেই হয় এবং পাড়ার ডাক্তার বা ওষুধের দোকান থেকে দু-চারটে ক্যাপস্যুল কিনে খেয়ে দিব্যি আছেন বলে ভাবছিলেন। কেন খামখা একগাদা পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখানো? তারপর কত হ্যাপা। এই টেস্ট - সেই পরীক্ষা . . . ইত্যাদি। . . . কিন্তু কিছুদিন পরে ওই ওষুধে আর জ্বরও কমে না—কাশিও কমে না। শেষে একদিন রাত্রে অবস্থা খুবই সিরিয়াস। সবাই মিলে হাসপাতালে ভর্তি করাল। কিন্তু কিছুতেই মামুলি ওষুধে আর ধরে না। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে শেষে দামি দামি ইঞ্জেকশন ও আরও কত কী করে শেষে এ যাত্রায় নিবারণবাবু রক্ষা পেলেন। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা বলছিলেন 3rd generation ciplalosporin antibiotic ছাড়া সংক্রমণ বা বুকের নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না। অন্য সব ওষুধে resistance বা প্রতিরোধ grow করেছে।

উপরের কাহিনি থেকে এটুকু অনুধাবন করা শক্ত হবে না যে যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের মতন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রকে আমরা অপব্যবহার করে ঠিকমতো কোর্স সম্পূর্ণ না করে নিজের অজান্তেই শরীরকে জীবাণুর আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এবং যখন সেই বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে—তার পূর্বের অপপ্রয়োগের জন্য আর উপকারে লাগে না। হারিয়ে যায় তার জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতা।

অ্যান্টিবায়োটিক কাকে বলে?

আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার আগে একটু অ্যান্টিবায়োটিক নামক ওষুধটি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাক। প্রায় ২৫০০ বছর আগে চীন দেশে ফোঁড়া বা Curbuncle-এ সয়াবিনের দুধের প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা হত। গ্রিক ফিজিসিয়ান হিপোক্রেটিস মদ্য পানীয় দিয়ে ক্ষত-র (wound) চিকিৎসা করতেন। উনিশ শতকে আর্সেনিক এবং বিসমাথ দিয়ে সংক্রমণের মোকাবিলা করা হত। ১৯৩৬-এ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় সালফোনামাইড দিয়ে। তারপর ১৯৪০-এ পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিন ওষুধ দু-টির আবিষ্কার ও প্রয়োগ এক নতুন যুগের সূচনা করে। ১৯২৮-এ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নোবেল পুরস্কার পান পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য। তারপর একে একে এসেছে ম্যাক্রোলাইডস্, সেফালোস্পোরিন সিনথেটিক পেনিসিলিন . . . ইত্যাদি।

এক কথায় অ্যান্টিবায়োটিক হল একটি রাসায়নিক যা কিনা শরীরের ভিতরে জীবাণুর বৃদ্ধি ধ্বংস করে বা তার জন্মকে প্রতিহত করে।

সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক, শরীরের ভিতরে জীবাণুর বৃদ্ধি হয় প্রতিরোধ করে অথবা মেরে ফেলে। এক্ষেত্রে টার্গেট হল কোষ বা কোষ প্রাচীর, কোষের পর্দা (cell membrane), প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড বা ফোলিক অ্যাসিড-এর উৎপাদন এর কোনো না-কোনো ধাপে আঘাত করা।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স (Resistance) বলতে বোঝায় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের নির্দিষ্ট টার্গেট এর উপর কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা। এক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি করতে পারে বা অনেক সময় জীবাণুরা আংশিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই রেজিস্ট্যান্স জন্মানোর পিছনে জীবাণুর অভ্যন্তরে জিনঘটিত পরিবর্তন ঘটানোকে (mutation) দায়ী করা হচ্ছে, যা কিনা অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলে। এরজন্য অপব্যবহারই বহুলাংশে দায়ী। এই misuse /abuse/overuse নানা কারণে হতে পারে।

শ্রেণীবিভাগ

- বিটা ল্যাকটামেস
  - পেনিসিলিন
  - সেফালোস্পোরিন
  - কার্বাপেনেম
- অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড
- টেট্রাসাইক্লিন
- ক্লোরামফেনিকল
- ম্যাক্রোলাইডস (এরিথ্রোমাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন)
- পলিমিক্সিন
- কুইনোলোনস (সিপ্রোফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন)
- নাইট্রোফুরানটোইন
- মেট্রোনিডাজোল
- ট্রাইমেথোপ্রিম
- গ্লাইকোপেপটাইডস
- সেফালোস্পোরিন

১। চিকিৎসকের দিক থেকে—ভুল ওষুধ, নির্বাচন বা তার ভুল মাত্রা প্রয়োগ ইত্যাদি।

২। রোগীর দিক থেকে— চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ ব্যবহার।

৩। ওভার দ্য কাউন্টার বিক্রি—ওষুধ বিক্রেতা তার অধিকারের বাইরে গিয়ে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিতরণ ও তার ভুল প্রয়োগ।

৪। লাইভস্টক এবং ভেটেরনারি ব্যবহার—যথা মুরগিকে তাড়াতাড়ি হৃষ্টপুষ্ট করে তুলতে একধরনের Antibiotic growth factor-এর জৈব ব্যবহার মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

এর ফলে কী কী অসুবিধা হতে পারে আমাদের?

চিকিৎসা দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং অসুস্থতা সহজে সারতে চায় না। মৃত্যুহার বাড়তে থাকে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে থাকে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়—যার ফলে এর প্রভাব অর্থনীতিতে পড়তে বাধ্য। এবং সর্বোপরি রোগীরা এই ধরনের প্রতিরোধী জীবাণুর ধারক ও বাহক রূপে cross resistance-এর জন্ম দেয়, যা কি না অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সমস্যাকে ব্যাপকতর করে, টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া, টিবি, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যৌনরোগ—HIV ইত্যাদি রোগের মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স-এর ভয়াবহতা আমাদের ভবিষ্যৎকে আতঙ্কিত করে। ইতিমধ্যেই MDR-TB বা মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টি.বি. রোগীর কাছে, চিকিৎসকের কাছে সর্বোপরি সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এই সমস্যার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে হলে যুক্তিপূর্ণ সুস্থ চিন্তার প্রসার ঘটাতে হবে সমাজের সর্বস্তরে। ওষুধ বিক্রেতা-ক্রেতা এবং চিকিৎসকের অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োজন।

কিন্তু কীভাবে এগোব?

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের আগে সচেতনভাবে এই ক-টি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

রোগটা কি সংক্রামক না অন্য কিছু? যদি সংক্রমণজনিত কারণে না হয়ে থাকে তবে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তা হবে অপব্যবহার। এমন অনেক মামুলি ইনফেকশন আছে, ধরুন গলা ব্যথা—কানে খোল—নাক বন্ধ----হাঁচি-কাশি-সর্দি (ঠান্ডা) এগুলোতেই সব থেকে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক-এর অপব্যবহার হয়। গলা ব্যথায় নুন মেশানো গরম জল গার্গেল, কানে খোল হলে কান পরিষ্কার, কানে ড্রপ, বন্ধ নাকে নুনজলের ড্রপ, হাঁচি-সর্দি-কাশিতে অ্যান্টিহিস্টামিনিক ও প্যারাসিটামল-ই যথেষ্ট। বেশিরভাগ ছোটোখাটো সংক্রমণ ২-৪ দিনের বিশ্রাম, একটু আলাদা থাকা, প্রচুর জল ও তরল জাতীয় খাদ্যগ্রহণ এর মধ্যেই রোগমুক্তি ঘটে।

তবে এর থেকে বেশি কোনো সংক্রমণ ঘটলে দেখতে হবে সেটার পিছনে যে জীবাণু আছে তা ভাইরাস না ব্যাকটিরিয়া। যদি ভাইরাস হয় সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ একেবারেই নেই। কারণ অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই ভাইরাসকে মারতে পারে না। যদি রোগটা সত্যিই ব্যাকটিরিয়াঘটিত হয় তবে তার শ্রেণি ও প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচন করলে সমস্যা হয় না। সেপসিস (SEPSIS)-এর মতো গুরুতর কোনো সংক্রমণের আশঙ্কা থাকলে গোড়াতেই তার লক্ষণগুলো চিনে নেওয়া জরুরি। তাপমাত্রা 102°F-এর উপর, নাড়ির গতি মিনিটে ১০০ বা তার বেশি, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘনঘন, মিনিটে ২০ বারের বেশি, রক্তে WBC বা শ্বেত কণিকা ১২০০০-এর বেশি রক্তচাপ (BP) কমে যাওয়া (G90SBP) ইত্যাদি লক্ষণগুলো সতর্কতার সঙ্গে বুঝে নিতে হবে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ নিতে হবে। কখনোই কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

আবার একথাও মনে রাখতে হবে অনেক সময় কোনো ইনফেকশন ছাড়াও জ্বর হতে পারে। সেক্ষেত্রে জ্বরের প্রকৃত কারণ সন্ধান না করে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করাটা মূর্খামির পরিচয়।

ইনফেকশন ছাড়াও জ্বর হতে পারে, যেমন—ড্রাগস (মাদক)/মদ ছেড়ে দিলে, স্যালাইন বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়ার পরে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। হার্ট অ্যাটাক, বাতজনিত কারণে ক্যানসার, লিভারের অসুখ হলে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে করানো জরুরি—প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির রিপোর্ট-এর উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা অনেক ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার কমছে

গত দু-দশকে এই সমস্যাটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অতীতে মেডিসিন, বিজ্ঞান এবং ওষুধ শিল্প যৌথভাবে নিত্য নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্যাটা অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কার বর্তমানে প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দশ বছরে আর তেমন কোনো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হবে না। আমাদের মতো দেশে প্রোটোকল মেনে অবিলম্বে হাসপাতালে, চিকিৎসকদের মধ্যে, নার্স প্যারামেডিক্স, স্টাফদের অ্যান্টিসেপটিক হাইজিন-এর চর্চা বাড়াতে হবে। নতুবা হাসপাতালে ভর্তি একজন সংক্রামিত রোগীর থেকে-চিকিৎসক-নার্স-প্যারামেডিক্যাল স্টাফের হাত ঘুরে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু ক্রমাগত সুস্থ রোগীকে সংক্রামিত করে চলবে।

মশা মারতে কামান না দাগিয়ে অর্থাৎ যে রোগের যে দাওয়াই না দিয়ে ছোটোখাটো মামুলি সংক্রমণে বড়োবড়ো ওষুধ প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ, কম ডোজ, বা নির্দিষ্ট দিনের চেয়ে কম দিনে চটজলদি মিরাকেল আশা করা বর্তমান চিকিৎসাক্ষেত্রে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরজন্য চাই সঠিক জ্ঞান বা সচেতনতা। তারজন্য সরকার পাবলিক, চিকিৎসক সমাজ, প্যারামেডিকেল স্টাফ, ওষুধ ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বন্ধ করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার বা অপপ্রয়োগ। কেবলমাত্র তবেই আগামী প্রজন্মকে এক প্রতিরোধী শক্তিবিহীন জীবাণুমুক্ত আবাহে উপযুক্ত বাসভূমি উপহার দিতে পারব। না হলে কেউ আমাদের ক্ষমা করবে না।

| ডা. মানস দাস, এমবিবিএস, ডিপকার্ড, হার্ট ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করেন এবং বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। |

হার্ট অ্যাটাক কি আটকানো সম্ভব?

হার্ট অ্যাটাক হবার পেছনে একটা লম্বা ইতিহাস থাকে, আর জীবনযাত্রার বদল এনে সেই ইতিহাসটা বদলানো যায়, শুধু বদলের কাজটা শুরু করতে হবে অনেক আগে থেকে—লিখছেন **ডা. দেবাণু ঘোষরায়।**

পুরুষদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, আর সেটা খুব বিরল নয়। অন্যদিকে, মেনোপজের পরে মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক-এর ঘটনা বাড়ছে। যেসব মহিলার ধূমপানের অভ্যাস বা ডায়াবেটিস আছে তাঁদের মেনোপজের আগেও এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি। হৃদ্‌যন্ত্রের এই রোগ শুধু রোগীদেরই চরম ক্ষতি করে না, পরিবারের অন্যদেরও খুব বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। বাড়ির কারও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শুনলেই পরিবারের সবাই ভেঙে পড়েন, আর তাতে মৃত্যু হলে তাঁদের অবস্থা হয় অবর্ণনীয়।

চিত্র:১.

যে সব প্রশ্ন মনে আসে

এ রোগের চিকিৎসা করেন যে চিকিৎসক, তাঁকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওনার তো কোনো অসুখই ছিল না, তাহলে এ রোগ এল কোথা থেকে? উনি তো একেবারে সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন, তাহলে কেন এই রোগ? কোনোদিন ভুলেও বিড়ি-সিগারেট খাননি উনি, মদের কথা তো ভাবাই যায় না, অথচ ওনারই . . . ? এই সেদিন মেডিক্যাল চেক আপ হয়েছিল ওনার, ইসিজি, টিএমটি, যা যা করার করেছিলেন, কিচ্ছু খুঁত পাওয়া যায়নি, তাহলে . . . ? অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করিয়েছিলেন তিনদিন আগে, ডাক্তার দেখে বললেন সামান্য একটা সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি কিছুই লাগবে না, কিন্তু তিনদিন পরেই এ কী হল . . . ?

হার্ট অ্যাটাক আটকানো সম্ভব?

সুতরাং প্রশ্ন উঠবেই, হার্ট অ্যাটাক কি সত্যিই আটকানো সম্ভব? উত্তর দেবার জন্য জানা দরকার হার্ট অ্যাটাক (বা আমরা অনেক সময় বলি, হার্টের স্ট্রোক) কেন হয়। বেশি কথা বলব না, শুধু বলি, শরীরের সব অঙ্গেরই বেঁচে থাকার জন্য ও কাজ করার জন্য প্রয়োজন রক্তের। সব অঙ্গে রক্ত নিয়ে যায় ধমনি, আর সেই 'বিশুদ্ধ' রক্ত থেকে কাজের জিনিসগুলো, যেমন অক্সিজেন আর খাদ্য, বের করে নেয় অঙ্গটি, তখন সেই 'অশুদ্ধ' রক্ত শিরার মাধ্যমে ফিরে আসে। আমাদের হার্ট তথা হৃদ্‌যন্ত্রেও 'বিশুদ্ধ' রক্ত সরবরাহ করে হৃদ্-ধমনি। সেই ধমনির ভেতরের গায়ে 'চাপড়া' জমে, ইংরাজিতে বলে plaque। চাপড়াগুলো আসলে চর্বিজাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি, ক্ষতিকর জিনিস। চাপড়া জমার ফলে হৃদ্-ধমনির ভেতরের ছিদ্র যায় ছোটো হয়ে, রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। আর এই চাপড়া জিনিসটা তেমন শক্তপোক্ত নয়, সেগুলো মাঝে মধ্যে ধমনির দেয়ালের মধ্যে ফেটে যায়, ও তাতে ধমনির রক্তস্রোত আটকে যায়; অর্থাৎ একটা ধমনি বা তার শাখা পুরো বন্ধ হয়ে যায় (করোনারি থ্রম্বোসিস)। ধমনি বা তার শাখা পুরো বন্ধ হয়ে গেলে হৃদ্‌যন্ত্রের যে অংশটা সেই ধমনি থেকে অক্সিজেন ও পুষ্টি পেত, সেই অংশটা দ্রুত মরে যেতে থাকে। সেটাকেই আমরা বলি 'হার্ট অ্যাটাক'।

মুশকিল হল, হৃদ্-ধমনির ভেতরের ছিদ্র কতটা ছোটো হয়ে গেছে ('স্টেনোসিস'), সেটা অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করে দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা থেকে চাপড়ার আয়তন খুব ভালো বোঝা যায় না। একটা বড়ো চাপড়া, যেটা ধমনির ছিদ্রের দিকে তেমন বাড়েনি (অর্থাৎ বেড়েছে ধমনির দেয়ালের দিকে), সেটা থাকলে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করে দেখা যাবে হৃদ্-ধমনির ভেতরের রক্ত চলাচলের পথ তেমন সরু হয়নি; ডাক্তারবাবু অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করে বলবেন, ''নাঃ, তেমন 'স্টেনোসিস' তো দেখছি না।'' হার্ট অ্যাটাকের অধিকাংশ রোগীর অ্যাঞ্জিয়োগ্রামে বড়ো মাপের 'স্টেনোসিস' থাকে না। চিকিৎসক রোগীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, বা টিএমটি ইত্যাদি পরীক্ষার সাহায্যে, অ্যাঞ্জিয়োগ্রামে বড়ো মাপের 'স্টেনোসিস' পাওয়া যাবে কি না, সেটা খানিকটা বলতে পারেন। আবার, বড়োমাপের 'স্টেনোসিস' পাওয়া গেলেই যে সে রোগীকে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে খুব লাভ হবে, তা কিন্তু নয়; এঁদের মধ্যে কয়েকটা নির্দিষ্ট ধরনের রোগীরই কেবল এইসব করে সুবিধা হতে পারে।

বিপজ্জনক চাপড়া (Vulnerable plaque)

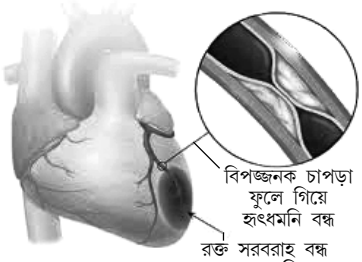

চিত্র:২.

যে চাপড়া সহজে ফেটে বা খসে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক ঘটাতে পারে, তাকে বলে বিপজ্জনক চাপড়া (vulnerable plaque)। চাপড়ার দু-টো মূল অংশ—একটা ভেতরের দিকের চর্বি-অংশ, আর অন্যটা বাইরের দিকের তন্তুময় 'ঢাকনা'। বিপজ্জনক চাপড়ার ভেতরের চর্বি-অংশটা বড়ো হয় আর বাইরের তন্তুময় 'ঢাকনা'টা পাতলা হয়, আর

প্রদাহের (inflammation) চিহ্ন থাকে। বিপজ্জনক নয় এমন চাপড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উলটো; চর্বি-অংশটা হয় ছোটো আর তন্তুময় 'ঢাকনা'টা মোটা। যদি কোনো রোগীর রোগলক্ষণ (যেমন বুকে ব্যথা) না থাকে, আর কেবল বিপজ্জনক নয় এমন চাপড়াই যদি তাঁর থাকে, তাহলে তাঁর 'স্টেনোসিস' বেশি (হৃদ্-ধমনির ভেতরের ছিদ্র অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টিতে বেশি সরু দেখাচ্ছে), এই যুক্তিতে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশনের প্রয়োজন নেই। তবে ওষুধ চালাতেই হবে।

কিন্তু কোনো চাপড়া বিপজ্জনক কিনা সেটা বুঝব কেমন করে? দুঃখের কথা হল, এখনও আমাদের হাতে তেমন প্রযুক্তি নেই যেটা দিয়ে বিপজ্জনক চাপড়া আর বিপদহীন চাপড়াকে খুব জোর দিয়ে আলাদা করে ধরা যায়। কিন্তু মনে হয় খুব শিগগির সেরকম প্রযুক্তি এসে যাবে। নতুন জেনারেশন মাল্টি-স্লাইস সিটি স্ক্যানার, ইন্ট্রাভাসকুলার আল্ট্রাসাউন্ড, অপ্টিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি এবং নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি—এইসব প্রযুক্তি বলতে পারবে কোন চাপড়াটা বিপজ্জনক আর কোনটা বিপজ্জনক নয়।

এখন যেটা করতে পারি

কিন্তু যতদিন সেইসব পরীক্ষা আমাদের হাতে না আসছে? মূল চিকিৎসা কিন্তু থাকবে, আর সেটা বেশ কার্যকরও। রক্তচাপ, রক্ত শর্করা ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, সমস্ত ধরনের তামাক থেকে দূরে থাকা, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ট্রান্সফ্যাট (বনস্পতি ও ওই জাতীয় তেল-চর্বি) যতটা সম্ভব কমানো, রেড-মিট (পাঁঠা/গোরু/শুয়োর) ছেড়ে দেওয়া, আর ফল ও সবজি বেশি খাওয়া—এইসবই হল হার্ট অ্যাটাক আটকানোর উপায়। মাছের তেলে (বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের তেলে) 'ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড' থাকে, কিছু তৈলবীজের তেলেও (ফ্লাক্সসীড অয়েল তথা আলসি কি তেল) এটা থাকে, সেটা খাওয়া দরকার।

নিয়মিত জোরে হাঁটা, ওজন ঠিক রাখা, যথেষ্ট ঘুম, টেনশন তথা 'স্ট্রেস' নিয়ন্ত্রণ, এসবের মূল্যও প্রমাণিত। তবে কতটা ব্যায়াম দরকার, ঠিক কতটা ওজন কমানো প্রয়োজন, 'স্ট্রেস' নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদ্ধতি কতটা কার্যকর, তাই নিয়ে আলাদা আলোচনা দরকার। যোগ ও ধ্যান উপকার করে বলেই সাধারণ ধারণা, তবে এ নিয়ে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন। রক্তে hsCRP নামক পদার্থটি বেশি থাকলে এবং/অথবা হার্ট অ্যাটাকের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। ইউরোপ আমেরিকায় এখন হার্টের অসুখ কমছে, কেননা তাঁরা এইসব ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছেন।

চিত্র:৩. দৌড়োনো, হাঁটা—'অ্যারোবিক ব্যায়াম' হার্ট অ্যাটাক আটকাতে সাহায্য করে

শেষের কথা

শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, হার্ট অ্যাটাক পুরো আটকানোর মতো জ্ঞান বা প্রযুক্তি এখনও আমাদের আয়ত্তে নেই। কিন্তু যেসব পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হল, সেগুলো মেনে চলতে পারলে আমাদের দেশেও হার্ট অ্যাটাক-এর সংখ্যা বাড়ার বদলে কমবে, সেটাই বড়ো আশ্বাস।

| ডা. দেবাণু ঘোষরায়, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, এফআরসিপি, কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে কার্ডিয়োলজি বিভাগে সিনিয়র কনসালট্যান্ট। |

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

এই অবস্থায় কী করা যায়?

একা না বোকা! একা-একা ডাক্তারি করছেন যাঁরা, তাঁরা অনেক সময়েই অসহায় বোধ করেন। চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণের বিরুদ্ধে মনে মনে ভাবেন হয়তো অনেক কিছুই, কিন্তু কাজের বেলায় গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন। কিন্তু সেটা অবশ্যম্ভাবী নয়—লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

আমি চিকিৎসক-জীবনের শুরুর ৮ বছর ছিলাম ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার শহীদ হাসপাতালে, তারপর ২০ বছর আছি হাওড়ার চেঙ্গাইলে কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আরম্ভ স্বাস্থ্য কর্মসূচি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই দু-টো কর্মসূচিতেই আমরা নৈতিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি/করি। যে বন্ধুরা আমার মতো কোনো গণসংগঠনের সঙ্গে থেকে ডাক্তারি করেন না, তাঁদের নীতিনিষ্ঠ থাকার কথা বললে অনেক সময় বলেন—প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে বা প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করে নীতিনিষ্ঠ থাকা যায় না। সত্যিই কি তাই? একজন ব্যক্তিগতভাবে কতটা সৎ থাকতে পারেন আর কীভাবে?

কোথায় আপনার চেম্বার?

অনেক ডাক্তার ওষুধের দোকানে চেম্বার করেন। ওষুধের দোকানে চেম্বার করা ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স আইন অনুযায়ী আইন-বিরুদ্ধ। আরেকটা গুরুতর অসুবিধা আছে, দোকানি অনেক ক্ষেত্রেই আপনাকে বলে দেবেন কোন ওষুধের কোন ব্র্যান্ড লিখবেন, যে ব্র্যান্ডে তার লাভ বেশি অবশ্যই সেই ব্র্যান্ড লিখতে বলবেন তিনি। দোকানির ইচ্ছায় অনেক সময় কাশির সিরাপ, এনজাইম প্রিপারেশন বা টনিকের মতো অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লিখতে বাধ্য হবেন আপনি। তাই ওষুধের দোকানে চেম্বার না করাই ভালো।

ভালো হল এমন কোথাও রোগী দেখা যা আপনার নিয়ন্ত্রণে আপনি যেখানে ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে নন।

> ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখার ঘর কমপক্ষে ১০০ বর্গফুটের হতে হবে। ২০০৩-এ পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রুলস প্রকাশের আগে থেকে যেসব চেম্বার আছে সেগুলো অবশ্য ৮০ বর্গফুটের হলে চলবে।
>
> পর্যাপ্ত অপেক্ষা করার জায়গা ও রিসেপশনের জায়গা থাকতে হবে। হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা চাই। জায়গাটা আরামদায়ক হওয়া চাই। রোগীদের জন্য টয়লেট থাকতে হবে।
>
> ডাক্তারের ফি কত তা প্রদর্শিত থাকা চাই।

অনেক ক্ষেত্রে এত মাপজোক মানা সম্ভব নয়, সব মাপজোক মেনে চেম্বার বানাতে অনেক খরচ। মাপজোক না মেনে চেম্বার করলে তা আইনবিরুদ্ধ হয়তো হবে, কিন্তু অনৈতিক নয়।

ইতিহাস নেওয়া, শারীরিক পরীক্ষা করা

ডাক্তারি শিক্ষার ক্লিনিক্যাল বছরগুলোর শুরুতে আমাদের ইতিহাস নেওয়া আর শারীরিক পরীক্ষা করা (history-taking and clinical methods) শেখানো হয়। ডাক্তার হওয়ার পর আমাদের অধিকাংশ সেসব ভুলে যাই। অথচ যথাযথ ইতিহাস-গ্রহণে রোগ-নির্ণয়ে ভুলের সম্ভাবনা কমে, কম ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করতে হয়, কম ওষুধ লেখা যায়। এসবের ফলে রোগীর খরচও অনেকটা কমে।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, সরবেড়িয়ার সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, বাঁকুড়ার ফুলবেড়িয়ার আমাদের হাসপাতাল একাজের জন্য এক ধরনের ফর্ম ব্যবহার করে। তেমনটা করতে পারেন আপনার ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসেও।

যদি রোগীর সংখ্যা বেশি হয়, নিজে পুরোটা করতে না পারেন, তাহলে

চিত্র:১. একটি অত্যাধুনিক রোগী দেখার ঘর (আমাদের দেশে দরকার নেই)

একজন কর্মীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিন। কাজটা ভালো হবে, একজনের কর্মসংস্থানও হবে।

প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি ও অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা

প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি কথাটা খটোমটো, ইংরেজি প্রতিশব্দ থেকে মানে বোঝা সহজ—Standard Treatment Guidelines—কোন রোগে কী পরীক্ষা করাবেন, কী চিকিৎসা করবেন, কোন ওষুধ দেবেন, কখন রেফার করবেন তা নির্দিষ্ট করা থাকে এই নির্দেশিকায়। 'উন্নত' দেশগুলোতে অনেকদিন ধরেই Standard Treatment Guidelines প্রচলিত। এমন নির্দেশিকা আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজ্যেও সরকার তৈরি করছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার Standard Treatment Guidelines আছে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ের মতো কিছু রাজ্যে, যদিও সেগুলো বহুল-প্রচলিত, বহুল-প্রচারিত নয়। এমন কোনো একটা Standard Treatment Guidelines মেনে চিকিৎসা করুন।

কোন ওষুধ লিখবেন, কোনটা লিখবেন না, ঠিক করতে কোনো এক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা ব্যবহার করুন—বিশ্বে স্বাস্থ্য সংস্থার বা ভারতের জাতীয় তালিকা। তাহলে অপ্রয়োজনীয় বা দামি ওষুধ লেখার সম্ভাবনা কমবে।

পরীক্ষানিরীক্ষা

কখন কোন পরীক্ষা করাবেন তা ঠিক করতেও Standard Treatment Guiddlines-এর সাহায্য নিন। মনে রাখবেন ঠিকমতো ইতিহাস নিলে, শারীরিক পরীক্ষা করলে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন কমে—অধিকাংশ সাধারণ রোগে পরীক্ষনিরীক্ষা ছাড়াই চিকিৎসা করা যায়, যদি করাতেই হয় তাহলে অল্প কিছু পরীক্ষা করালেই হয়।

আরেকটা গুরুতর অন্যায় হল—ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থেকে কমিশন খাওয়া। যে অঞ্চলে আমাদের কাজ, সেই উলুবেড়িয়া মহকুমায় ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ৫০%, আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ২৫%, সিটি স্ক্যানে ৩০%-এই রকম কমিশন ডাক্তার পেতে পারেন। মনে রাখবেন কমিশন নেওয়া-দেওয়া কেবল অন্যায় নয়, আইন-বিরুদ্ধও। ডায়াগনোস্টিক সেন্টারকে বলুন আপনার রোগীদের দেয় অর্থ থেকে কমিশনের অঙ্কটা বাদ দিয়ে নিতে। এমনটা সম্ভবপর।

ওষুধ লেখা

ওষুধ লেখার আগে নিজে কতগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়ার চেষ্টা করুন:

১। রোগীর কি সত্যিই ওষুধের দরকার আছে?

২। ওষুধ ঠিক কী জন্য দেওয়া হবে—রোগ সারানোর জন্য? রোগের কষ্ট কমানোর জন্য? নাকি রোগীকে বোঝানোর জন্য যে তাঁর জন্য কিছু করা হচ্ছে?

৩। ওষুধটা কি রোগীর জন্য ও তাঁর নির্দিষ্ট অসুখের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ওষুধ?

৪। ওষুধটা কি একই ধরনের সবচেয়ে কমদামি ওষুধ? যদি না হয়, তাহলে এর থেকে কমদামি কোনো ওষুধ দিয়ে কি একই কাজ পাওয়া যেতে পারে?

৫। এই ওষুধের জন্য রোগীকে কোন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হতে পারে?

৬। ওষুধ ব্যবহারে যে লাভ হবে তা কি ওষুধ ব্যবহারে সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে বেশি?

৭। রোগী আর যা যা ওষুধ ব্যবহার করেন সেগুলোর সঙ্গে এই ওষুধের কোনো আন্তঃবিক্রিয়া আছে কি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যদি ওষুধ লেখেন, তাহলে অনৈতিক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন

জেনেরিক নামেই ওষুধ লেখা উচিত। কিন্তু আপনি জেনেরিক নামে ওষুধ লিখলেই কি রোগী জেনেরিক ওষুধ পাবেন? না, অধিকাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে উৎপাদিতই হয় না। এমনকী ২০১১-এ প্রকাশিত জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকার ৩৪৮টা ওষুধের অধিকাংশই জেনেরিক নামে পাওয়া যায় না। আপনি জেনেরিক নামে ওষুধ লিখলে দোকানি সেই ব্র্যান্ডটা দেবেন যাতে তাঁর লাভ বেশি।

তার চেয়ে ভালো হল কমদামি ব্র্যান্ড লেখা। CIMS বা MIMS বা Drug Today থেকে কোনো ওষুধের কমদামি ব্র্যান্ড খুঁজে বের করুন। অথবা সাহায্য নিন www.medguideindia.com-এর মতো কোনো ওয়েবসাইটের।

কাছাকাছি কোনো ওষুধের দোকানকে বলুন এই ব্র্যান্ডগুলো রাখতে। কেউ রাখতে রাজি না হলে, নিজেই রাখুন রোগীদের সরবরাহ করার জন্য।

ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া আপনি ওষুধ বিক্রি করতে পারেন

ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ১৯৪০-র চতুর্থ অধ্যায়ে ওষুধ ও প্রসাধনী উৎপাদন, বিক্রি ও সরবরাহ নিয়ে বলা হয়েছে। ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স রুলস, ১৯৪৫-এর একাদশ খণ্ডে বলা হয়েছে অ্যাক্টের চতুর্থ অধ্যায়ের নিয়ম থেকে কীভাবে ছাড় পাওয়া যেতে পারে।

বলা হয়েছে যে ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই একজন রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার নিজের রোগীদের ওষুধ সরবরাহ করতে পারেন, অন্য এক রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারের অনুরোধে তাঁর রোগীদের ওষুধ সরবরাহ করতে পারেন, যদি সে ওষুধ সেই বিশেষ রোগীর অসুস্থতার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তবে তিনি ওষুধের দোকান খুলে বসতে পারবেন না, ওষুধ আমদানি-উৎপাদন-সরবরাহ-বিক্রি বড়ো মাপে করতে পারবেন না।

এই ছাড় পেতে গেলে অবশ্য কিছু বিষয় মানতে হয়

১। ওষুধ কিনতে হবে লাইসেন্স-প্রাপ্ত ডিলার বা উৎপাদকের কাছ থেকে, ওষুধ কেনার নথিতে ওষুধের নাম, পরিমাণ, ব্যাচ নম্বর, প্রস্তুতকর্তার নাম-ঠিকানা থাকতে হবে। এইসব নথি ড্রাগ ইন্সপেক্টর পরীক্ষা করতে পারেন, প্রয়োজন মনে করলে পরীক্ষা করার জন্য ওষুধের নমুনাও নিতে পারেন।

২। ওষুধ যদি শিডিউল G, H বা X-ভুক্ত হয় তাহলে এ ছাড়াও:

(ক) যে রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার ওষুধটা সরবরাহ করেছেন তাঁর নাম-ঠিকানা ওষুধের লেবেলে থাকতে হবে।

(খ) ওষুধ যদি শরীরের বাইরে লাগানোর জন্য হয় তাহলে লেবেলে লিখতে হবে 'For external use only', যদি শরীরের ভেতরে গ্রহণ করার জন্য তাহলে লেবেলে ডোজ অর্থাৎ মাত্রা লিখতে হবে।

(গ) ওষুধটার নাম বা ফর্মুলেশনটার উপাদানগুলো এবং তাদের পরিমাণ, কী মাত্রায় ওষুধটা দেওয়া হয়েছে, রোগীর নাম, সরবরাহের তারিখ, যিনি প্রেসক্রিপশন করেছেন তাঁরা নাম—এসব এক বিশেষ রেজিস্টারে নথিবদ্ধ করতে হবে ওষুধ সরবরাহের সময়।

(ঘ) রেজিস্টারে নথিভুক্তির সময় একটা নম্বর দিতে হবে, সেই নম্বর লিখতে হবে ওষুধের পাত্রের লেবেলে।

(ঙ) রেজিস্টারে শেষ নথিভুক্তির দিন অথবা প্রেসক্রিপশনের দিন থেকে দুই বছর অবধি রেজিস্টার এবং প্রেসক্রিপশন থাকলে প্রেসক্রিপশন সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। ওষুধের লেবেলে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে ওষুধ যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে।

মনে হতে পারে এমনটা করা ঝক্কির। কিন্তু আমার পরামর্শ হল—একজনকে রোগীদের ওষুধ সরবরাহ, ওষুধ কেনার নথি রাখা, রেজিস্টার রাখার কাজে নিয়োগ করুন। যে দামে আপনি ওষুধ কিনবেন তার এবং ওষুধের MRP-এর মাঝে যে প্রচুর ফারাক তাতে এই ব্যক্তিকে বেতন দিয়েও আপনার লাভ থাকবে।

যদি চাকরি করেন

যদি সরকারি হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারে চাকরি করেন তবে চেম্বার, ওষুধ বিক্রি করা, বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করা—এগুলো আপনি করতে পারবেন না। কিন্তু রোগীকে পরীক্ষা, তার ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ওষুধ লেখা—এসব ব্যাপারে একই নীতি মেনে চলতে অসুবিধা নেই। সরকারি হাসপাতালে আউটডোরে কিছু কিছু ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়—সেগুলোর অনেকগুলোই বিজ্ঞানসম্মত—সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেবার চেষ্টা করুন। রেল, সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট হেলথ স্কিম—ইএসআই—এসব হাসপাতালে অনেক ধরনের ওষুধের সরবরাহ থাকে, এবং তার মধ্যে থেকে ওষুধ লেখার জন্য সরকারি ডাক্তারদের ওপর কিছুটা চাপও থাকে—সেটা মূলত ভালোই। রাজ্য সরকারের হাসপাতালগুলোতে আউটডোরের তুলনায় অনেক কম ওষুধ দেওয়া হয়, আর সেখানকার ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের ওপর বাধানিষেধও কম—সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করুন যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার স্বার্থে। এদেশে অনেকগুলো (ধর্মীয় বা অন্যান্য) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হাসপাতাল চালান, তাঁরাও সাধারণভাবে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন লেখার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন—সেসব ক্ষেত্রে একইভাবে রোগীকে যত্ন করে দেখে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা কম করে, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ওষুধই লেখা সম্ভব—এবং সেটাও সব চাইতে কম দামের ব্র্যান্ড নামে।

প্রাইভেট কর্পোরেট হাসপাতালেও একইভাবে রোগী দেখা সম্ভব। তাতে হয়তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তত খুশি থাকবেন না, হয়তো আপনার পকেটে তেমন মোটা অঙ্কের চেক আসবে না মাসের শেষে। সেটা মেনে নিতে হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাইভেট হাসপাতাল 'ব্যাবসা না পেলে গলাধাক্কা'-র নীতি নেয়, সেটা অস্বীকার করা যায় না। তখন আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনি কোন পক্ষে থাকবেন, ব্যাবসাদারের পক্ষে না রোগীর পক্ষে।

চিত্র:২. ব্যাগে ভরা শুধু ওষুধ ও উপহার নয় ডাক্তারদের শিক্ষা তথা মগজ ধোলাইয়ের উপকরণও বটে

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভকে আপনার শিক্ষকের জায়গায় বসাবেন না। ওষুধ কোম্পানির পয়সায় কনফারেন্সে যাওয়া বা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ তো দূরের কথা, **ছোটোখাটো কোনো উপহার বা ফিজিশিয়ান্স স্যাম্পেলও নেবেন না মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছ থেকে।** মনে হতে পারে নিলে কীই-বা মহাভারত অশুদ্ধ হবে, কিন্তু কোনো-না-কোনো ভাবে আপনি প্রভাবিত হবেনই এমনটা নিলে। আর তেমনটা হওয়া কাম্য নয়।

| ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে তোলা এক ক্লিনিকে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক ও *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক। |

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা

মন্দাক্রান্তা সেন

—আপনার তো ব্রেন টিউমার হয়েছে।

চোখ দেখাতে গিয়ে ডাক্তারবাবুর এহেন তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয়ে সে থতমত খেয়ে গেল। নাহ্, ভয় সে পায়নি। শুধু স্তম্ভিত হয়েছিল। সে জানত নানাবিধ ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষার পরই এমন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। কিন্তু তার মা তার সঙ্গে গেছিলেন, তিনি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তাঁকে নিয়ে বাড়ি আসাই মুশকিল। কিংবা, যার কিনা ব্রেন টিউমার হয়েছে, তাকে নিয়ে মা-এর বাড়ি ফেরা তো আরও কঠিন।

চোখের দৃষ্টির অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘুরত। মনে হল একবার স্নায়ুরোগের চিকিৎসককে দেখিয়ে নেওয়াই ভালো। হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। একগাদা টেস্টও হল। বিশেষ করে এম.আর.আই ও সি.টি স্ক্যান অফ ব্রেন। কিছু পাওয়া গেল না। তবু কিছু স্নায়ুরোগের ওষুধ খেতে হল। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি ব্রেন টিউমার-ই হত, তাহলে কিছু টেস্ট না করেই রোগীর মুখের ওপর কথাটা বলা তার কাছে অসংবেদনশীলতাই মনে হয়েছিল। শুধু অসংবেদশীল নয়, অর্বাচীনও।

ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি, খোদ ডাক্তারের মুখে—ওর অসুখ-টসুখ কিছু হয়নি, ওসব ম্যানিয়া। ম্যানিয়া বলতে সার্বিকভাবেই মানসিক রোগ বোঝাত। এবং ভাবা হত, একে পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই, ওসব ওর মনের অসুখ। কিন্তু পরে ভেবেছি, মনের অসুখও তো একটা অসুখ, যার চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যার পেটে গ্যাসট্রাইটিসের ব্যথা হচ্ছে, আর যে মনে করছে যে তার পেটে খুব ব্যথা করছে, তাদের যন্ত্রণার মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। দু-টিই তো অনুভূতির ব্যাপার। সংবেদনশীল ডাক্তার বরং মনের অসুখটাকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন, রোগীকে মানসিক অসুখের চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন। কিংবা প্ল্যাসেবো দেবেন, যাতে অনেক সময় রোগ সেরেও যেতে পারে।

ডাক্তার কেমন হবেন, তার একটা আঁচ করা যায় তার ডাক্তারি পড়ার সময়টায়। একটি ছাত্রী হস্টেলে একা বিছানায় পড়ে আছে, তার জন্ডিস। সে কথা শুনে তার পরিচর্যা করার পরিবর্তে তার সহপাঠী ছুটল শরীরে বিলিরুবিনের স্বাভাবিক মাত্রা কত সেটা ঝালিয়ে নিতে। সরকারি চিকিৎসালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুরুষ-ওয়ার্ডে লিভার-সিরোসিসের রোগী বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে, আর তার ব্যথাভরা যকৃৎ টিপেটুপে দেখছে একদল ছাত্র। রোগীটি দশজনের অনুসন্ধিৎসা সহ্য করেছে, তারপর করুণ মিনতির স্বরে বলছে—আর পারছি না ডাক্তারবাবু, বড্ড লাগছে, এবার আমায় ছেড়ে দিন। কিন্তু আগের দশজন ছাত্র যা দেখেছে, সেটা এগারো নম্বর ছাত্র দেখতে পাবে না কেন? অতএব চলো, প্যালপেট করে যাও। এ বড়ো গণ্ডগোলের ব্যাপার। সত্যিই, না প্যালপেট করলে ছাত্ররা ডাক্তারিটা শিখবে কী করে, পরবর্তীকালে রোগীর চিকিৎসা করবে কী করে . . . কিন্তু, আর একটু ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্ডে জ্যান্ত রোগী টিপেটুপে দেখা যায় না?

একটি কিশোরী মেয়ের ব্রেস্ট ক্যানসার, সে ওয়ার্ডে সবার সামনে কিছুতেই জামা খুলবে না। তার কান্নাকাটিতে কারও কোনো কান নেই। বরং ডাক্তারি শেখার পাশাপাশি এমন ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্য উৎসাহ কাজ করে। সে যাক, সিস্টারদের বলে মেয়েটির বেডের চারপাশে কাপড় দিয়ে একটা ঘেরাটোপের ব্যবস্থা তো করা যায়! নাকি সেসব সম্ভ্রম ঝাঁ চকচকে প্রাইভেট হাসপাতালে পয়সা দিয়েই কিনতে হয়! একজন পুরুষের যৌনাঙ্গে কোনোও অসুখ, তাকে পরনের কাপড় খুলে ওয়ার্ডের বেডে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল—এ কী অসভ্যতা। তাকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা যেত না? সে তো দিব্যি সচল। তার যথেষ্ট বুদ্ধিও আছে। এক মিনিট পরেই সে 'ডাক্তারবাবু একটু বাথরুম থেকে আসছি' বলে হাওয়া। ওদিকে ছাত্ররা তখন তার জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

সরকারি হাসপাতালের ডেলিভারি রুমে এক প্রসূতি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলেন। শুনতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু এক জুনিয়ার ডাক্তার, পুরুষ, তাঁকে বলে বসলেন: চুপ! এক্কেবারে চুপ! চুপ না করলে মারব এক থাপ্পড়। ঘটনাস্থলে ডিউটি করছিলেন আরেক জুনিয়ার ডাক্তার, নারী। তিনি ভর্ৎসনার সুরে পুরুষ ডাক্তারটিকে বললেন: তুই চুপ কর। তুই কোনোদিন বুঝবি কেন উনি চিৎকার করছেন?

অসংবেদনশীলতার এই প্রত্যুত্তর আমাদের আশান্বিত করে। সবাই তাহলে এক নয়।

অন্যদিকে এক যুবতী প্রসূতিকে সিজারিয়ান সেকশন করার পর যখন সেলাই দেওয়া হয়, তখন ভিতরে রয়ে যায় খানিকটা গজ। সেপসিস হয়ে যায়, প্রসূতি বাঁচেননি। একে কী বলা যায়, অসংবেদনশীলতা, নাকি সার্বিক উদাসীনতা?

বুকে প্রচণ্ড কফ জমায় নামডাক-ওয়ালা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এক যুবক। তাকে ডাক্তার নির্দেশ দিলেন ট্রেড মিল টেস্টের। যুবকটি মুখ হাঁ করেও বাতাস টানতে পারছে না। অক্সিজেন-মাস্ক দিলেও কে জানে কেন তাকে নেবুলাইজার দেওয়া হয়নি। সে ট্রেডমিল টেস্ট করতে অস্বীকার করে। ডাক্তারের ডাক্তারির নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই থেকে থাকবে, কিন্তু রোগীর কষ্টকে অর্বাচীনতার সঙ্গে তিনি তুচ্ছ করেছিলেন।

এবার একটি স্পর্শকাতর বিষয় ছুঁয়ে যাওয়া যাক। মাঝেমধ্যেই খবর চোখে পড়ে সরকারি হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা নানা বিষয়ে তাঁদের বিক্ষোভ জানাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন। তাঁদের দাবির সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও বলতে হয়—এতে তো কাছে-দূরের নানান রোগী চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যান। এদিকটা একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। অন্যভাবেও কি প্রতিবাদ জানানো সম্ভব? অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বাকবিতণ্ডা এমনকী তাঁকে কিছু সময়ের জন্য ঘেরাও-ও! বড়োজোর একঘণ্টার জন্য প্রতীকী কর্মবিরতি? অথবা রিলে অনশন? তাহলে বিশেষ করে দূর দূর থেকে আসা রোগীদের বড়ো উপকার হয়।

ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্মরত জুনিয়ার ডাক্তারদের এই বিক্ষোভে অংশ না নিলেই ভালো। তাঁরা কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদে শামিল হতে পারেন। এই বিষয়টিকে একটু সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিচার করার অনুরোধ রইল।

এবার একটা ছোট্ট গল্প

এক রোগী, মানসিক অসুখে ভুগছেন। ভর্তি আছেন একটি স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে রয়েছেন কনসালটেন্ট মানসিক রোগের চিকিৎসকও। রোগীকে দেখেশুনে তিনি নিদান দিয়ে দিলেন, এ রোগ সারবার নয়। তরুণ রোগীর বাকি জীবনটা এমনটাই কাটবে। বড়োজোর ওষুধে আচ্ছন্ন হয়ে সে একটি ভেজিটেব্‌লে পরিণত হবে। এ রোগের কোনো ওষুধ নেই।

রোগীর বাড়ির লোক হতাশ হলেও হাল ছাড়লেন না। খুঁজে বার করলেন এক ডাক্তারকে। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি সংবেদনশীলতা ও ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুললেন তাকে। বলা যায় আত্মহত্যাপ্রবণ সেই রোগীকে নতুন ভাবে বাঁচতে শেখালেন তিনি।

তাই সে লিখতে পারল এই লেখাটা।

| মন্দাক্রান্তা সেন, কবি। |

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ প্রকাশনা

প্রাপ্তিস্থান: শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র চেঙ্গাইল,বেলতলা, হাওড়া

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কার ও একদল লড়াকু ডাক্তারের গল্প

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ভাইরাস-ঘটিত হেপাটাইটিসের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি—যেমন হেপাটাইটিস-সি এদেশে খুব সহজপ্রাপ্য। তাই তার কার্যকর ওষুধ সফসবুভির (Soposbuvir) যখন মার্কিন মুলুকে আবিষ্কৃত হল, তখন আমাদের রোগীরা ভরসা পেলেন। কিন্তু দাম দেখে চক্ষু চড়কগাছ—৫০ লক্ষ টাকা! তারপর কী হল? বলছেন **ডা. অর্ক বৈরাগ্য**।

সোহমের বয়স এখন ১২, জন্ম থেকেই ও থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। বেশ কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত রক্ত পেয়ে আসছে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু গত মাসে ডাক্তারবাবু রক্তের রিপোর্ট দেখে বললেন হেপাটাইটিস-সি হয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এটি ভাইরাস সংক্রমণজনিত লিভারের এক রোগ যা সম্পূর্ণ সারিয়ে দেওয়ার দাওয়াই ডাক্তারদের কাছে নেই। রক্তের মাধ্যমে রোগটা ছড়ায় বলে আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু থ্যালাসেমিয়া রোগী এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, কারণ বারবার শরীরে রক্ত দেওয়ার ফলে ওই রোগের জীবাণু রক্তের মাধ্যমে রোগীর দেহে প্রবেশ করছে। দান করা বা ক্যাম্পে সংগ্রহ করা রক্ত বহু পরীক্ষা করার পরও সম্পূর্ণরূপে ওই হেপাটাইটিস-সি রোগের ভাইরাস থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। WHO-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে ভারতে ১.২ কোটিরও বেশি মানুষ হেপাটাইটিস-সি-এর সংক্রমণে আক্রান্ত।

যেকোনো হেপাটাইটিস-সি রোগের রোগীকে এই রোগ প্রায় সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়, নেই কোনো সম্পূর্ণ নিরাময়—এই ছিল এত দিনকার চলতি ধারণা। রোগীকে পেজাইলেটেড ইনটারফেরন নামে একটি ইঞ্জেকশান দেওয়া হত, তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও ছিল অনেক। যুগান্তর এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য আবিষ্কৃত একটি অভিনব ওষুধের হাত ধরে। নাম সফসবুভির। ওষুধ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত আবিষ্কৃত ওষুধ হিসেবে এটি বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। ২০১৩ সালে আমেরিকার FDA সংস্থা এটি অনুমোদন দিলে GILEAD নামের ওই ওষুধ প্রস্তুতকারী-সংস্থা পেটেন্ট আইনের সাহায্য নিয়ে উন্নত দেশগুলিতে (যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স) ওই ওষুধটির দাম ধার্য করে ১২ সপ্তাহের জন্য ৬০,০০০ থেকে ৯০,০০০ মার্কিন ডলার (টাকার হিসেবে গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা)। কোম্পানিটি এও বলে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ওষুধ ২০-৫০ শতাংশ ছাড়ে বিক্রি করা হবে।

সফসবুভির একটি মুখে খাওয়ার বড়ি; প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে এটি হেপাটাইটিস নির্মূল করতে সক্ষম। স্বভাবতই গণমাধ্যম জুড়ে সাড়া পড়ে যায় ও বিভিন্ন মহল থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। 'ডক্টরস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' আর 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস' নামের দুই সংগঠন এর অতিরিক্ত দামের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিসে আবেদন করে। এখানে এই 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস' সংগঠনটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৭১ সালে গঠিত এই ফরাসি সংগঠন শুরু হয় কিছু ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাংবাদিকদের নিয়ে, যাঁরা বিশ্বাস করেন জাতি ধর্ম বিত্ত প্রতিপত্তি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অধিকার আছে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার এবং মানুষের এই প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক সীমারেখার অনেক ওপরে। এই সংস্থা দু-টির বেশি পরিচিতি পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কাজ করার জন্য। মুখ্য কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে। শুরুর সময় থেকেই সংগঠনটি কোনোরকম ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক প্রভাবের বাইরে থাকার চেষ্টার ওপর জোর দিয়েছে। ১৯৯৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় সংস্থাটি। বিশ্বজুড়ে অত্যাবশ্যক ওষুধ-এর পক্ষে প্রচার চালায় 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস'। কয়েক বছর আগে নভারতিস কোম্পানি ভারতে ইমাটিনিব (রক্তের ক্যান্সারে ব্যবহৃত হয়) এর পেটেন্ট নিতে চাইলে ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে যে মামলা করে তাতে এই সংস্থা সমর্থন জানায় এবং ওষুধটির জেনেরিক উৎপাদন ও স্বল্প মূল্যের অনুকূলে কথা বলে।

সফসবুভির-এর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। সংগঠনের পক্ষে রন ওয়াল্ডম্যান বলেন ওষুধটির উৎপাদন ব্যয় যেখানে প্রায় ১৫০ মার্কিন ডলার সেখানে GILEAD-এর উচিত সমস্ত হেপাটাইটিস-সি রোগীর কথা মাথায় রেখে ওষুধটির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা। সারা বিশ্বে ১৮ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত, এদের মধ্যে ৯০ শতাংশ মানুষ থাকেন স্বল্প ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে। ওয়াল্ডম্যান আরও বলেন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে সরকারের সর্বোচ্চ ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং যে-সমস্ত 'মেধাস্বত্ব সুরক্ষা' আইন জনস্বাস্থ্যের প্রতিকূল তাদের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন।

ওয়াল্ডম্যানদের এই আবেদন ইউরোপিয়ান পেটেন্ট অফিসে অনুমোদিত হয়। ফলস্বরূপ ২০১৫-র জানুয়ারি মাসে মুম্বাইয়ের পেটেন্ট আদালত ওষুধটির পেটেন্ট সুরক্ষা খারিজ করে এবং সর্বাধিক ৩০০ মার্কিন ডলার মূল্যে ভারতে সফসবুভির-এর লভ্যতা নিশ্চিত করে। পেটেন্ট আইন লাগু না হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে অন্য কোম্পানিও এই ওষুধ তৈরি করতে পারবে, এবং কম দামে এই অত্যাবশ্যক ওষুধ মানুষের নাগালে আসবে।

পরিশেষে, ওষুধের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই ওষুধ—এই বক্তব্যে বহু মানুষ আজও লড়ে যাচ্ছেন দুনিয়াজুড়ে। জেনিফার কন বা রন ওয়াল্ডম্যানদের এই প্রতিবাদের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না, তবু তাঁরা হাল ছাড়েননি। 'লিভিং ইন ইমারজেন্সি' নামের ডকুমেন্টারিতে ফুটে উঠেছে সে ছবি। দেশ কালের সীমানা পেরিয়ে মানুষের অধিকারের লড়াই কি থেমে থাকে কখনো? ইতিহাস তো তেমন বলে না।

ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস, মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়ার ডাক্তার।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র

কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২

(প্রথম অংশ)

২০০২ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (Medical Council of India) ডাক্তারদের অবশ্য পালনীয় একটি 'কোড অফ এথিক্স' তথা 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ' জারি করে। তারপর তার কিছু সংশোধন হয়। এখানে আমরা ২০১০ সাল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত সংশোধন সমেত সেই কোডের অনুবাদের প্রথম অংশ পেশ করছি। আইনি বিষয় অনুবাদে সামান্য এদিক-ওদিক খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন। ইন্টারনেটে এই আইনটি ইংরাজিতে পাওয়া যায় মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইটে; আমরা এটি পেয়েছি http://www.mciindia.org/RulesandRegulations/CodeofMedicalEthicsRegulations2002.aspx থেকে।

'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (Medical Council of India) বা সংক্ষেপে এমসিআই হল ভারতে সমস্ত ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এখানে 'ডাক্তার' বলতে আধুনিক চিকিৎসার ডাক্তারদের (লোকমুখে যা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলে সমধিক পরিচিত) কথা বুঝতে হবে, অন্যান্য ধারার চিকিৎসক, যথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র নেই।

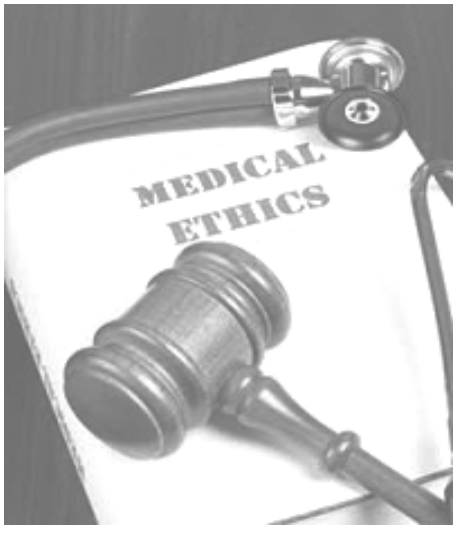

ভারতে ডাক্তারি (আধুনিক) শিক্ষাব্যবস্থার মান স্থির করা ও তা বজায় রাখা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র অন্যতম কাজ। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডাক্তারি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ভারতে আইনি মান্যতা পাবে কিনা সেটাও এমসিআই ঠিক করে। ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার মান নির্ধারণ করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও এই সংস্থারই। এর গঠন খুব কম কথায় বলতে গেলে, হল এইরকম। একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা রয়েছে, সেটার নাম 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া', সংক্ষেপে এমসিআই; কিন্তু এমসিআই একা এই দায়িত্ব পুরোটা পালন করে না। প্রতিটি রাজ্যে রয়েছে একটি করে 'স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল' (যেমন আমাদের রাজ্যে আছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল') যা সেই রাজ্যের কাজের অনেকটা দেখাশোনা করে, এবং একটি রাজ্যের ডাক্তারদের নাম-ঠিকানা সেই রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর কাছেই সাধারণভাবে নথিভুক্ত থাকে।

রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর একটা আইনি ভূমিকা রয়েছে। কোনো ডাক্তার তাঁর কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা দেখার প্রাথমিক আইনি দায়িত্ব মেডিক্যাল কাউন্সিল-এরই; যদিও কোনো রোগী ডাক্তারের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে করলে সরাসরি ক্রেতা সুরক্ষা আদালত বা সাধারণ আদালতের শরণাপন্ন হতেই পারেন। কিন্তু সেখানেও মেডিক্যাল কাউন্সিল ডাক্তারির যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছে, মোটামুটি সেই মানই বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। তাই মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র 'কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন' ডাক্তার ও রোগী—দু-জনের ক্ষেত্রেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা সেই কোডের অনুবাদ প্রকাশ করছি। এই সংখ্যায় তার প্রথম অংশ। আইনি বিষয় অনুবাদে সামান্য এদিক ওদিক খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন, সেটি ইন্টারনেটে লভ্য।

এমনিতে 'এথিক্স' বা 'নৈতিক নিয়মাবলি', বললে মনে হয় যেন এটা মানুষের ভেতর থেকে আসা ভালোমন্দ বোধের ব্যাপার। কিন্তু মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র 'কোড অফ এথিক্স' কেবল ভালোমন্দ বোধের ব্যাপার নয়, এটা একটা আইনি কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপার। 'এথিক্স' (Ethics) কথাটার আভিধানিক অর্থ 'নৈতিক নিয়মাবলি' বা 'আচরণবিধি'। 'কোড অফ এথিক্স' (Code of Ethics) কথাগুলোর অর্থ তাহলে দাঁড়ায় 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ'। 'রেগুলেশন' কথাটার মানে হল 'নিয়মকানুন' বা 'নির্দেশ'। 'কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন'—এই পুরো কথাটার মানে তাহলে দাঁড়ায়, 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ সংক্রান্ত নির্দেশ'। কথাগুলো খটোমটো সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনি পরিভাষাগুলো

এইরকমই হয়ে থাকে, পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন।

ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬-এর ১০২) ২০এ ধারায় [যা ৩৩(m) ধারার সঙ্গে একযোগে পড়তে হবে]। প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমোদনসহ ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিল, চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ, সহবত এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত নীচের বিধিগুলো প্রণয়ন করেছে।

চিকিৎসকের/ডাক্তারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য

একজন চিকিৎসকের/ডাক্তারের অবশ্যই এমবিবিএস অথবা এমবিবিএস সঙ্গে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা চিকিৎসা চর্চার ক্ষেত্রে সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে।

চিকিৎসককে/ডাক্তারকে তার পেশার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখতে হবে।

মানবসেবাই চিকিৎসা-পেশার মূল লক্ষ্য, পুরস্কার বা আর্থিক লাভ গৌণভাবে বিবেচ্য। যিনি এই পেশায় নিয়োজিত হবেন বলে মনস্থ করেছেন তাঁকে পেশার আদর্শ অনুসারে নিজেকে চালিত করতে হবে। তিনি হবেন একজন ঋজু মানুষ, যিনি রোগীর আরোগ্য লাভ করানোর পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত। তাঁকে একজন বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ হতে হবে; রোগীর পরিচর্যায় যথেষ্ট পরিশ্রমী হতে হবে। তিনি হবেন বিনয়ী, নম্র, ধৈর্যশীল। নিরুদ্বিগ্নমনা হয়ে তিনি দ্রুততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব/কর্তব্য পালন করবেন। তাঁর পেশায় এবং জীবনের সমস্ত কাজকর্মে তিনি ন্যায়পথে চলবেন।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃত এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তার ব্যতিরেকে কেউই আধুনিক পদ্ধতিতে ডাক্তারি বা অপারেশন করতে পারবেন না। অন্য চিকিৎসাবিদ্যায় যোগ্যতা অর্জনকারী কোনো ব্যক্তি আধুনিক পদ্ধতিতে কোনোভাবেই প্র্যাকটিস করতে পারবেন না।

কী করে ভালোভাবে মেডিক্যাল প্র্যাকটিস করতে হয়

পেশা ও মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ সম্ভ্রম বজায় রেখে মানুষের সেবা করাই হল চিকিৎসা-পেশার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। চিকিৎসকের/ডাক্তারের প্রতি রোগীর যে আস্থা তার সম্পূর্ণ মর্যাদা বজায় রেখে, প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। চিকিৎসককে/ডাক্তারকে ক্রমাগত চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের উন্নতি সাধন করে যেতে হবে এবং তার থেকে অর্জিত জ্ঞান চিকিৎসক/ডাক্তার, রোগী ও সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। চিকিৎসক/ডাক্তারকে যন্ত্রণা উপশমের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির চর্চা করে যেতে হবে এবং তিনি সে পদ্ধতির মূলনীতি যাঁরা মানেন না তাঁদের সঙ্গে পেশাগতভাবে জড়িত হবেন না।

ডাক্তারি পেশার এই আদর্শ শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের ওপর প্রয়োগ না করে, গোটা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া একজন চিকিৎসকের কর্তব্য।

মেডিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ

নিজের পেশায় উন্নতির জন্য একজন চিকিৎসককে/ডাক্তারকে অবশ্যই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অ্যাসোসিয়েশন বা সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এবং একইসঙ্গে সেই সংস্থার কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে।

চিকিৎসা-শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পেশাগত আলোচনা সভা বা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে, প্রতি পাঁচ বছরে অন্তত পক্ষে ৩০ ঘণ্টা চালু চিকিৎসা-শিক্ষায় (continuing medical education) অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্বীকৃত সংস্থাই এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজক হবেন।

চিকিৎসা-নথির রক্ষণাবেক্ষণ

একজন চিকিৎসক/ডাক্তারকে তাঁর ইনডোর রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, যেদিন তিনি প্রথম চিকিৎসা করিয়ে ছিলেন সেদিন থেকে পরের ৩ বছর অবধি মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মান্য প্রোফর্মা অনুযায়ী নথিভুক্ত করে রাখতে হবে।

রোগী বা রোগী অনুমোদিত সহযোগী বা আইনি কর্তৃপক্ষ যদি মেডিক্যাল রেকর্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তবে অনুরোধের প্রাপ্তি স্বীকার করে মেডিক্যাল রেকর্ড চাওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা পাঠিয়ে দিতে হবে।

একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার/চিকিৎসক মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের রেজিস্টার রক্ষা করবেন, যা সরবরাহ করার সময় তাতে সার্টিফিকেটের যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত থাকবে। এই সার্টিফিকেটে রোগীকে শনাক্ত করার জন্য শনাক্তকরণ চিহ্ন থাকবে ও সার্টিফিকেটের একটা কপি নিজেদের কাছে রেখে দিতে হবে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বা রিপোর্টে অবশ্যই সই বা বুড়ো আঙুলের ছাপ বা রোগীকে শনাক্ত করার কোনো একটা চিহ্ন থাকবে।

তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করার জন্য গোটা প্রক্রিয়াটা কম্পিউটারে নথিভুক্ত হলে ভালো।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদর্শন

প্রত্যেক চিকিৎসককে/ডাক্তারকে স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল/মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর, তার ক্লিনিকে, ব্যবস্থাপত্রে, সার্টিফিকেটে, মানি রিসিটে, যা যা তিনি রোগীকে দেবেন সেখানে উল্লেখ করতে হবে।

চিকিৎসককে/ডাক্তারকে তার নামের নীচে তাঁর সমস্ত স্বীকৃত ডিগ্রি/ডিপ্লোমা এবং সদস্যপদ/সম্মান এই সবই দিতে হবে, যা থেকে তার পেশাদারি জ্ঞান বা যোগ্যতা/সাফল্যের স্বীকৃতি বোঝা যায়।

জেনেরিক ওষুধের নাম ব্যবহার

প্রত্যেক চিকিৎসককে/ডাক্তারকে যতটা সম্ভব জেনেরিক ওষুধই ব্যবস্থাপত্রে লিখতে হবে। যুক্তিসম্মত ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধের যুক্তিসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করবেন।

রোগীর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া

একজন চিকিৎসকের কর্তব্য হল, চিকিৎসা পেশাতে যাতে যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় বা নৈতিক মান যথাযথ নয় এমন ব্যক্তি না প্রবেশ করতে পারে সেটা দেখার জন্য সহায়তা করা। 'মেডিক্যাল অ্যাক্টস'-এর আওতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে চিকিৎসক তার সহায়করূপে নিযুক্ত করতে

পারবেন না, এবং যেখানে কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যই জরুরি সেসব ক্ষেত্রে সেইসব ব্যক্তিকে রোগীর চিকিৎসা করা ও অপারেশন করতে অনুমতি দেবেন না।

অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হওয়া

চিকিৎসককে/ডাক্তারকে দুর্নীতি, অসততা ও চিকিৎসকদের/ডাক্তারদের একটা অংশের অনৈতিক কাজকর্মকে নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে হবে।

পেশাদার পরিষেবার দাম

চিকিৎসককে/ডাক্তারকে রোগীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই ডাক্তারি চর্চা/চিকিৎসা চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। রোগীদের আর্থিক অবস্থা তার সুচিকিৎসার পথে অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। চিকিৎসা/ডাক্তারি করার আগে এবং অপারেশনের আগে চিকিৎসককে/ডাক্তারকে 'ডাক্তারি ফি' জানিয়ে দিতে হবে, পরে নয়। রোগীর সঙ্গে 'রোগ সারলে টাকা নইলে নয়'— এইরকম কোনো চুক্তি করা যাবে না। যেকোনো অবস্থাতেই চিকিৎসক/ডাক্তার যখন রাষ্ট্রের/রাজ্যের পক্ষ থেকে পরিষেবা প্রদান করছেন তখন টাকা নেওয়া চলবে না।

আইনি বাধা-নিষেধ কৌশলে পরিহার করা

চিকিৎসককে/ডাক্তারকে ডাক্তারি চর্চা/চিকিৎসা চর্চার ক্ষেত্রে দেশে যে আইন আছে তা পালন করতে হবে এবং এই আইনকে 'বুড়ো আঙুল' দেখায় যারা তাদের সাহায্য না করা। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত আইন ও বিধি বলবৎ করায় সাহায্য করা। রাজ্য সরকারের কিছু আইনিধারা আছে সেগুলো চিকিৎসক/ডাক্তারকে পালন করতে হবে। যথা—ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ১৯৪০; ফার্মাসি অ্যাক্ট, ১৯৪৮; নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসটেন্স অ্যাক্ট ১৯৮৫; মেডিক্যাল টারমিনেশান অব প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৭১; ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন অব হিউম্যান অরগ্যান অ্যাক্ট, ১৯৯৪; মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট, ১৯৮৭; এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬; প্রি-ন্যাটাল সেক্স ডিটারমিনেশন টেস্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৪; ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪; পার্সন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস (ইকুয়্যাল অপোরচুনিটিস অ্যান্ড ফুল পার্টিসিপেশন) অ্যাক্ট, ১৯৯৫; বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং) রুল্‌স, ১৯৯৮ এবং আরও অনেক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রণীত আইন বা আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা প্রণীত আইন যা জনস্বাস্থ্যকে রক্ষা করে ও প্রসার করে।

সংক্ষেপে

- এখানে ডাক্তার/চিকিৎসক বলতে অন্তত এমবিবিএস ডিগ্রিধারী বোঝানো হচ্ছে।
- তিনি পেশার মর্যাদা বজায় রাখবেন; মানবসেবাকে অগ্রাধিকার দেবেন, পরিশ্রমী, বিনয়ী, নম্র, যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হবেন।
- এমবিবিএস এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র রেজিস্ট্রিভুক্ত না হলে কেউ আধুনিক পদ্ধতিতে (অ্যালোপ্যাথি) চিকিৎসা করতে পারবেন না।
- ডাক্তার নিজের রোগীর ভালো করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ও নিজে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা আরও ভালো করে জানার চেষ্টা করবেন; সারা সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চা ছড়াতে সাহায্য করবেন; চিকিৎসকদের পেশাগত অ্যাসোসিয়েশনে যুক্ত হবেন ও তাদের আলোচনা সভায় যোগ দেবেন ও চিকিৎসা-শিক্ষা চালু রাখবেন।

ডাক্তার তাঁর ইনডোর-চিকিৎসার সমস্ত রোগীর নথি তিনবছর পর্যন্ত নিজ-তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত রাখবেন ও রোগী চাইলে তা দেবেন। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে রোগীর শনাক্তকরণ চিহ্ন ও সই/টিপছাপসহ একটি কপি ডাক্তার নিজের কাছে রাখবেন, প্রক্রিয়াটা কম্পিউটারাইজড হলে ভালো হয়।

- ব্যবস্থাপত্র, টাকার রসিদ, সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে ডাক্তার তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখবেন ও স্বীকৃত ডিগ্রি-ডিপ্লোমা, সদস্যপদ লিখবেন।
- ডাক্তার ওষুধের জেনেরিক নাম যথাসম্ভব ব্যবহার করবেন।
- রোগীর প্রতি যত্ন নেবার জন্য মেডিক্যাল আইনসমূহে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন এমন কাউকে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা-কর্মে সহকারী হিসাবে নেবেন না।
- সমস্ত অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে ডাক্তার সরব হবেন।
- ডাক্তারের সব ধরনের 'ফি' আগেই জানাতে হবে। 'রোগ সারালে ফি' নেবার চুক্তি করা চলবে না।
- দেশে ডাক্তারির সমস্ত আইন মেনে চলবেন ও যারা তা মানে না তাদের সাহায্য না করা, এবং সরকারের বিভিন্ন আইন বলবৎ করায় সাহায্য করা ডাক্তারের কর্তব্য।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরবর্তী সংখ্যায় এই অনুবাদটির দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত হবে।

| অনুবাদ: ডা. জয়ন্ত দাস ও দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায় |

Advt.

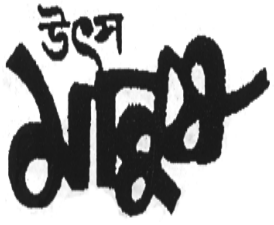

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্যে ভাবতে ও করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য-ভুবন

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর আত্মস্মৃতি

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

The memoirs of Dr. Haimabati Sen, Translated by Tapan Roychaudhuri, Edited and introduced by Geraldine Forbes, Lotus Collection / Roli Books : New Delhi, 1998, Rs.495/-

আদতে ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপিটি বাংলাতেই লেখা। তাঁর উত্তরসূরিদের থেকে এটির কথা জানতে পারেন জেরালডিন ফোবস, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক এবং মানবীবিদ্যাচর্চা বিভাগের ডিরেক্টর। তাঁর Foremother Legacies প্রকল্পে তিনি এই জাতীয় প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছেন। ডা. সেন-এর দিনলিপির বিষয়বস্তুতে তিনি এতটাই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন যে ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরীকে (সম্প্রতি প্রয়াত) দিনলিপিটি অনুবাদ করার অনুরোধ জানান। তপন রায়চৌধুরী সোৎসাহে সম্মতি দেন এবং দ্রুত কাজটি সমাধা করেন।

বইটি আমার হাতে এলে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলি। আমার মনে হল মূল পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে কতই-না ভালো হত। প্রথমত, মূলের স্বাদ কখনোই অনুবাদে (তা যত দক্ষ অনুবাদ হোক-না-কেন) পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, হৈমবতীর লেখায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যরস আমরা আস্বাদন করতে পারতাম। সব থেকে বড়ো কথা, এদেশের যে-নারীরা এখনও ইংরেজিতে কোনো লেখা পড়তে পারেন না বা চান না, তাঁরা অনায়াসেই বাংলায় প্রকাশিত হলে হৈমবতীর দিনলিপি পড়ে ফেলতে পারতেন। তাঁদের জন্য হৈমবতীর দিনলিপি অবশ্যপাঠ্য বলেই আমার মনে হয়। আমার এইসব কৌতূহল নিয়ে অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, মূল দিনলিপিটি প্রকাশিত হবে। বস্তুত মূল এবং অনুবাদ দু-টি এক সঙ্গেই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। নানা কারণে মূলের প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে, তবে হবে। এর মধ্যে তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে। ডা. হৈমবতী সেন-এর মূল পাণ্ডুলিপিটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আদৌ হবে কি না তাও আমাদের জানা নেই। এদেশে যাঁরা মানবীবিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত—এমন এক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি কী করে তাদের নজর এড়িয়ে গেল, তাই ভাবছি।

এমন এক রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসের মতো আত্মকথার (যা মনে করিয়ে দেয় বাস্তব সবসময়েই কল্পকাহিনির থেকে বিস্ময়কর) স্বাদ আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রথম কিস্তিতে জেরালডিন ফোবস-এর ভূমিকা থেকে ডা. সেন-এর আত্মকথা কেন আমাদের অবশ্যপাঠ্য সে প্রসঙ্গে আলোচনা থাকবে। পাঠকদের তরফে চাহিদা থাকলে পরে কয়েক কিস্তিতে হৈমবতীর জীবনের নানা বাঁক ও মোড়, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর মানবিকতা, অদম্য প্রাণশক্তি, নির্ভীক, অকপট উচ্চারণ—এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

জেরালডিন ফোবস-এর মতে হৈমবতীর এই আখ্যানে যতটা বিশদ এবং অনুপুঙ্খভাবে তাঁর আত্মকথা বিধৃত হয়েছে, উনিশ শতকীয় নারীদের যে ক-টি আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনোটাই হৈমবতীর তুল্য নয়। তাঁর আখ্যানে বালিকা বধুর দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতা, মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে নারীদের আর্থিক শোষণ, যৌন নিপীড়নের বিবরণ আছে। হৈমবতীর দুর্জয় সাহস ও অপার সহিষ্ণুতার পরিচয় মেলে এই আখ্যানে। এই আত্মকথা এমন এক বালবিধবার কাহিনি, যিনি কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে দোরে দোরে ঘুরেছেন, এ-দেওয়াল থেকে সে-দেওয়ালে মাথা ঠুকে চলেছেন কিন্তু লেখাপড়া শেখার উচ্চাশা এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেননি এবং শেষপর্যন্ত একজন প্রশিক্ষিত মহিলা চিকিৎসক হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁর আখ্যানে ধরা আছে দুস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রমের বিবরণ। যে সমাজে পুরুষের একছত্র দাপট, তারাই সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তাদের অঙ্গুলিহেলনে নারীদের যন্ত্রবৎ ওঠাবসা—সেই সমাজে কীভাবে এক তুচ্ছ নারী হয়েও তিনি পুরুষগড়া এই জগতে এক সম্মানজনক পেশায় জীবিকা নির্বাহ করার হিম্মত দেখাতে পেরেছিলেন; যদিও তাঁর মতো তেজি নারীসত্তাও এ জগতে শেষ পর্যন্ত পরাধীন থেকে যেতে বাধ্য হন—তারও এক সংগ্রাম-করুণ বর্ণনা এই আত্মকথায় মিলবে। যদিও হৈমবতীর কালে সমাজে নারীর ভূমিকা ধীরে ধীরে হলেও এক নতুন আকার নেওয়া শুরু করেছিল তবুও হৈমবতীর মতো নারী, যাঁরা লেখাপড়া শিখেছেন, পরে বিবাহ করেছেন এবং নিজের পেশায় নিযুক্ত থেকেছেন তাঁরাও কিন্তু শেষ অবধি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারতন্ত্রের অধীন থাকতে বাধ্য ছিলেন। নারীসত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি সে যুগে তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এখনও কি তা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠতে পেরেছে?

দিনলিপি থেকে হৈমবতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের খুলনা জেলায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক (পাঁচ বছরের ছোটো) হৈমবতী ঘোষের জন্ম ১৮৬৬ সালে। কথিত আছে তাঁর পরিবার যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি। ঠাকুরদা শিবনাথ ঘোষ খুবই সাহসী এবং কৃষক-দরদি ছিলেন। চাষিদের পক্ষ নিয়ে তিনি নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেব রেনির বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে তাঁকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা জমিদারদের যেসব খারাপ স্বভাব—মদ্যপান, নাচ-গান-নাটক নিয়ে প্রমোদবিলাস, বেশ্যাগমন—তার পাঁকে ডুবে গিয়েছিলেন। ফলে ক্রমেই তাদের অবস্থা পড়তে থাকে।

প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়াতে হৈমের মা মোটেই খুশি হতে পারেননি। কিন্তু বাবার খুব আনন্দ হয়েছিল—সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন মেয়েকে যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা হয়। আদর করে ডাকতেন 'চূণীবাবু' (ছেলেদের নাম) বলে এবং হৈম যা ইচ্ছে তাই করতেন—কারও বাধা দেওয়ার সাহস ছিল না। অন্য মেয়েরা যখন অন্তঃপুর থেকে বেরোনোর কথা ভাবতেই পারত না; হৈম ছেলেদের পোশাক পড়ে ভাইদের এবং জ্ঞাতিদের সঙ্গে বাইরের ঘরে সারা দিন কাটাতেন। তারা যখন লেখাপড়া করতে বসত, হৈম পাশে বসতেন; কিন্তু ছেলেদের মতো প্রথামাফিক পড়াশোনা করার অধিকার তাঁর ছিল না। এক স্কুল ইন্সপেক্টরের সুনজরে পড়ে তিনি ভাইদের সঙ্গে পড়াশোনা করা, পরীক্ষায় বসার অনুমতি পান। তিনি যখন লেখাপড়ায় মগ্ন; সামাজিক প্রথানুসারে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় সাড়ে নয় বছর বয়সে। বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। এর মধ্যে তার দু-দুটো বউ গত হয়েছে। হৈমের থেকে সামান্য ছোটো দু-টি মেয়েও আছে তার। মদ্যপ ও লম্পট মানুষটির ভারী দুঃখ, একটাও ছেলে হল না। সেজন্যে তার নাগরীকে অনুরোধ করেছিল নতুন কনেকে যেন একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়। তবে তার কামাগ্নিতে জল ঢেলে দিল তার শরীর। লিভার ফেটে মরে গেল বেচারি! কুমারী অবস্থাতেই বালবিধবা হয়ে গেলেন হৈমবতী।

১৮৭৬ সাল। বালবিধবাদের তখন চরম হেনস্থা। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ভাগ পাওয়া তো দূরের কথা, ঠাঁই-ই মেলে না। বাপের বাড়িও তথৈবচ। মা-বাবা-শাশুড়ি মারা গেলে হৈমর ভাই বা দেওর কেউই তাঁকে ঠাঁই দিল না। হৈম চলে গেলেন বেনারস। আর সব বালবিধবাদের সঙ্গে হৈমর তফাত একটা জায়গায়—তিনি লিখতে পড়তে জানেন ও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেনারসে যে আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে টেকা গেল না—এক তো দেওর টাকা-পাঠানোর যে কথা দিয়েছিল তা রাখেনি আর জ্ঞাতিবউ মনে করেছিল, এ সংসারে থাকলে আগুন জ্বালাবে।

কপালজোরে এক ভারতীয় সংস্কারকের স্কুলে পড়ানোর কাজ পেলেন। তার জেরে যে বৃদ্ধ শিক্ষক কাজ খোয়ালেন তিনি তো হৈমের উপর মহা খাপ্পা। বেনারসে তাঁর দিনকাল ভালো কাটেনি। একে বালবিধবা, মাথার উপর কেউ নেই, তায় রূপসী, তন্বী। তখন তাঁর বিশ বছর বয়স। যেখানেই যান, কামুকদের লালসা-নজরে পড়ে যান; ফিসফিসানি গুজবও রটে কম না। এমন একটা অসহনীয় অবস্থায় তিনি শুনলেন, কলকাতায় বিধবাদের আশ্রমে থাকার এবং পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যস, মনস্থির করে ফেললেন—যে করেই হোক লেখাপড়া করতেই হবে; চলে এলেন কলকাতায়।

হৈমর বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাতে তাঁকে দমানো যায়নি। ভারি সরল মন ছিল তাঁর; খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। এই মনটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন। সেইসব 'তথাকথিত অনাত্মীয়' আপনজনেরাই সংকট সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এইরকমই একজন তাঁর কলকাতা-যাওয়ার টিকিট কেটে দিলেন। আর একজন তৎকালীন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ও দুর্গামোহন দাসকে একটা সুপারিশপত্র লিখে দিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন বিলেত রওয়ানা হওয়ার মুখে। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত হৈমকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) এক ব্রাহ্ম-পরিবারের হাতে সঁপে দিলেন। সেখানে হৈমর জীবনযাপনের দিনলিপি পড়লে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। তাঁর বিবরণে আছে, এক জমিদার পরিবারে কার্যত বন্দি জীবন কাটাচ্ছিলেন এবং কীভাবে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। কীভাবে এক খামখেয়ালি বেয়াড়া রানির খপ্পরে পড়েছিলেন। তাঁর বিবরণে তিনি রাজা, মহারাজা (মূলত জমিদার) কিংবা ব্রাহ্ম কাউকেই রেয়াত করেননি। তাঁর সঙ্গে তারা নামে এক বিধবার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, যিনি ব্রাহ্মদের পরিচালিত বিধবা-আশ্রমে থাকাকালীনই গর্ভবতী হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মদের প্রথামাফিক লিখিত ইতিহাসে কিন্তু এ ধরনের ঘটনার লেশমাত্র পাওয়া যাবে না।

পূর্ব বাংলায় নিছক দু-টি অন্নের আশায় তাঁকে এ-পরিবার থেকে সে-পরিবারে ঝি-এর কাজ করতে হত। হিন্দু সমাজে পরিণত বয়স্ক বিধবাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তখনকার দিনে পত্নী বিয়োগ হয়েছে অথচ ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বড়ো করতে হবে, এমন ব্রাহ্ম পুরুষরা বিধবা বিয়ে করতেন (তখন বিধবাবিবাহ আইন সদ্য প্রচলিত)। তাঁরা দলে দলে হৈমকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে উত্যক্ত করে তুলতে লাগলেন। যারা কেবল বাড়ির ঝি-গিরি করার লোক চায়, হৈম তাদেরকে রীতিমতো ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। যাঁকে হৈমর মনে ধরেছিল, তাঁর মা অসবর্ণ ও বিধবার সঙ্গে বিবাহে বেঁকে বসলেন। হৈমর ঘর করা হল না।

সেকালে যাঁরা একটু এগিয়ে থাকা মানুষ তাঁরাও কিন্তু মনে করতেন একজন নারীর ঘর-বর থাকবে; সেটাই স্বাভাবিক। প্রাপ্তবয়স্ক যৌন-আবেদনময় স্বামী-বিহীন নারী সমাজের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক। ঢাকায় হৈমর এক শুভার্থী পরামর্শ দিলেন, 'তুমি বিয়ে করো, না হলে এ-সমাজে টিকতে পারবে না। যে পরিবারে আশ্রয় নেবে তার কর্তা-গিন্নির মরজিমাফিক তোমায় চলতে হবে, তাদের ক্ষমা-ঘেন্নাতেই তোমার দিন গুজরান।' কলকাতাতেও তাঁর হিতার্থীরা তাঁকে বললেন, 'আগে বিয়ে করো, তারপর লেখাপড়া। বিয়ে না করলে টিকতেই তো পারবে না, লেখাপড়া হবে কী করে?' হৈম সায় দিলেন। ২৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল ব্রাহ্ম কুঞ্জবিহারী সেনের সঙ্গে, যার গায়ের রং ছিল ঘোর কালো।

বিয়ের পর হৈমর লেখাপড়া করার অনুমতি মিলল। কিন্তু কুঞ্জবিহারী বিহারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকার্যে চলে গেলেন। হৈম তখন মেয়েদের জন্য ছোটো একটা স্কুলে আবাসিক রূপে থাকতেন। স্বামী ফিরে এলে তাঁরা দু-জনে ঘর করতে শুরু করলেন। একটি মৃত শিশু প্রসব করায় হৈম ভারী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হয়তো মনমরা ভাব কাটাতেই তাঁরা দু-জনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। ফিরে এসে ফের সংসার করতে লাগলেন।

এই সময়েই ক্যাম্পবেল-এ নারীদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলার প্রস্তাব দিলেন স্যার এ ডব্লু ক্রফট। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় দিকের পুরুষ ডাক্তাররা প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। রংপুরের কার্যনির্বাহী সিভিল সার্জন ডা. আর এল দত্ত ঘোষণা করলেন, ''মফস্সলে হাসপাতালে সহায়তা করার জন্য কোনো মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই।'' কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী এই পেশায় আসবেন না এবং ভারতীয় নারীরাও এদের কাছে চিকিৎসা করাবেন না। তাঁর আশঙ্কা এই প্রস্তাব অনুমোদন পেলে, ইউরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির দুর্নাম রটবে।

অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ১৮৮৮ সালে ১৫ জন নারীকে নিয়ে শুরু হল ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল। এঁদের কয়েক জনের সঙ্গে হৈমর আলাপ হল। তিনি জানতে পারলেন এঁরা সরকারি বৃত্তি তো পানই; সঙ্গে পান ডাফরিন-তহবিল থেকে বৃত্তি, নানা জেলা ও পৌরবোর্ড থেকে বৃত্তি (শর্ত থাকে যে পাশ করার পর সংশ্লিষ্ট জেলা বা পৌরসভায় কাজ করতে হবে)। হৈম ঠিক করলেন তিনি ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলেই ভর্তি হবেন; এটাই হবে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও উপার্জনের রাস্তা। ভর্তি হওয়ার পরীক্ষায় পাশ করে হৈম ২৬ বছর বয়সে ১৮৯১ সালে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন।

হৈম ৭ টাকা সরকারি বৃত্তি পেতেন। তাঁকে স্কুলের মাইনেও দিতে হত না। প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে যে চারজন প্রথম ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। অ্যানাটমি, ফিজিয়োলজি এবং ম্যাটেরিয়া মেডিকা-তে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। শবব্যবচ্ছেদ করতে হবে শুনে মেয়েরা কী পরিমাণ ভয় আর আতঙ্কে ভুগত, সে কাহিনি পাওয়া যাবে হৈমর দিনলিপিতে। তাঁদের দেওয়া হয়েছিল একটি নগ্ন পুরুষ শব। সামাজিক সংস্কার ও জাত্যাভিমান কাটিয়ে সেকালে এই কাজ যে কতটা দুঃসাধ্য তা আজকের দিনে অনুমান করাও কঠিন। যেখানে পরপুরুষের দিকে তাকালেই নারী অশুচি হয়ে যায়, সেখানে পরপুরুষকে স্পর্শ করা। তার ওপর মড়া ঘাঁটা—ও কাজ তো ডোমেদের! কীভাবে শিক্ষকের সহায়তায় এইসব নানা সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়া টপকে তাঁরা শেষপর্যন্ত শব ব্যবচ্ছেদ করতে পারলেন তাও তিনি দিনলিপিতে বিবৃত করেছেন। মেডিক্যালের পড়াশোনা, বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম সবই তিনি করতেন; বৃত্তির টাকায় সংসারের সুরাহাও হত।

হৈম পরীক্ষায় ভালো ফল করতে লাগলেন। এতটাই ভালো যে পুরুষ সতীর্থদের চোখ টাটাতে লাগলে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় হৈমকে যখন স্বর্ণপদক দেওয়ার বন্দোবস্ত পাকা তখন এই পুরুষপুঙ্গবেরা এমন হুজ্জত পাকাল যে কর্তৃপক্ষ উভয়পক্ষকে আলোচনায় ডাকলেন। তিনি ছেলে কোলে নিয়ে সেখানে গিয়ে জানালেন যে সোনার মেডেলে তাঁর কোনো লোভ নেই; রুপোর মেডেল পেলেই হবে, তবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শোনার অনুমতি দিতে হবে। তিনি সেটা পেয়েছিলেন।

কৃতিত্বের সঙ্গে মেডিক্যাল পড়াশোনা শেষ করলেও কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ছিল। তিনি সাদা-চামড়া নন, তায় হিন্দু-নারী এবং ডিগ্রিটাও মেডিক্যাল কলেজের নয় এবং চিকিৎসা করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। পুরুষ-ডাক্তারের আধিপত্যের দুনিয়ায় ডাফরিন-তহবিল প্রতিষ্ঠিত কলকাতার জেনানা হাসপাতালেই শুধু মহিলা ডাক্তাররা কাজ পেতেন—তবে তাঁরা সবাই বিদেশি, সাদা চামড়া। কলকাতার সরকারি ও দাতব্য হাসপাতালগুলো পুরুষ-ডাক্তারই নিয়োগ করতেন; তাঁরাই নারীপুরুষ সকলের চিকিৎসা করতেন। মেডিক্যাল কলেজের মহিলা-গ্র্যাজুয়েটরা অনেকেই তিতিবিরক্ত হয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা শুরু করলেন; ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় যাঁদের অন্যতম। সদর রাজধানীতে মহিলা ডাক্তারদের কোনো চাহিদা নেই দেখে তাঁরা মফস্সলের দিকে চোখ ফেরালেন।

হৈম স্বামীসহ চুঁচুড়ায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয় এক ভদ্রলোক তাঁদের শহরের জন্য মহিলা-ডাক্তার খোঁজ করছিলেন। সেটি ছিল নতুন ইমামবাড়া হাসপাতাল। সেখানে হৈমবতী কাজ পেলেন। মাসে ৪০ টাকা মাইনে। পরে বেড়ে হয়েছিল ৫০ টাকা। ১৮৯৪-এ হৈমবতী হাসপাতালে যোগ দেওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। রিপোর্টে হাসপাতালের খুব প্রশংসা করা হল। কিন্তু রিপোর্টে যা ছিল না, তা হল কী ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হৈমবতীকে হাসপাতালে কাজ করতে হত। ইমামবাড়া হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন এবং সিভিল সার্জনের অধীনে তিনি কাজ করতেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডা. বদ্রিকানাথ মুখার্জি তাঁকে যৌনহেনস্থা করতেন, যৌনরোগ বিষয়ে আলোচনার নামে অশালীন ইঙ্গিত করতেন, এমনকী বেশ কয়েকবার হৈমর ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পেটোয়া লোকজনকে দিয়ে হৈমকে মারধোর পর্যন্ত করেছেন। সিভিল সার্জনের কাছে অভিযোগ জানালে হৈম তিরস্কৃত হন। পরে অবশ্য অন্য একজন সিভিল সার্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে মহিলা-হাসপাতাল থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেন।

সিভিল সার্জনরাই ছিলেন হৈমর 'বস'। ডা. মুখার্জির যোগসাজশে এক সিভিল সার্জন হৈমর 'পর্দা ব্যবস্থা'য় আপত্তি জানালেন। আর একজন তো জাল মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে প্রচুর টাকা ঘুস খেয়েছিলেন। তৃতীয় জন তাঁর কথা সহৃদয়তার সঙ্গে শুনেছেন এবং অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে হৈমর পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই মহিলা-হাসপাতালে হৈমর পুরুষ সহকারীদের (একজন নার্স, একজন কম্পাউন্ডার) নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রশিক্ষিত মহিলা নার্স বা ফার্মাসিস্টরা কেউই কলকাতা ছেড়ে নড়তে চাইতেন না। হৈমকে তো কাজটা চালাতে হবে; তাই তিনি পুরুষদের দিয়েই ওইসব কাজ করিয়ে নিতেন।

সবারই জানা কথা যে গরিব নারীরা, পুরুষের পাশে থেকেই গায়ে-গতরে খাটে। তাদের অত হায়া-শরমের বালাই নেই। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তাদের নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই। যত মাথাব্যথা উচ্চকোটির নারীদের নিয়ে, যে মহলে পর্দাপ্রথা এক কড়া সামাজিক রীতি। ভারতীয় উপরমহলের মন জয় করার জন্যই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পর্দা বা জেনানা হাসপাতাল চালু করেছিল। হৈমবতী নিজে পর্দা-ফর্দার খুব একটা ধার ধারতেন না। তিনি মনে করতেন নারীদের যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করাই তাঁর ব্রত; সামাজিক রীতি রক্ষার কোনো দায় তাঁর নেই।

পুরুষের দুনিয়ায় একজন পেশাদার নারীর কাজ করা যে কত কঠিন সেসবের বর্ণনাও তাঁর দিনলিপি থেকে পাওয়া যায়। কেমন ডাক্তার ছিলেন হৈমবতী সেন? তাঁর নিজের কথা ছাড়াও তৎকালীন নথি ঘেঁটে জানা যায়, তিনিই জেলার একমাত্র মহিলা ডাক্তার।

তিনি হাসপাতালে এবং ব্যক্তিগতভাবে হাজার-হাজার রোগীর চিকিৎসা করতেন। সে সময়ে তাঁর হাসপাতাল কলকাতার ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালের থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। তাঁর নিজের বয়ানে এবং রিপোর্ট থেকেও তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের রমরমার কথা জানা যায়।

সাধারণভাবে সেসময়ে অপারেশন করতেন সিভিল সার্জন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন। মহিলা-ডাক্তাররা অপারেশনে সহকারীরূপে কাজ করতেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালের মধ্যেই হৈম নিজে নিজেই অপারেশন

করা শুরু করলেন। আটকে থাকা অমরা (placenta) বার করে নেওয়া; জটিল প্রসব করানো; ফোঁড়া কাটা; আঁচিল বা আব কেটে বাদ দেওয়া, দাঁত তোলা এবং হাড়ে সামান্য ফ্র্যাকচার হলে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া—এসব ছোটোখাটো অপারেশন তিনি করতেন। ১৯০০ সালের মধ্যে তিনি অন্তত দশটা বড়ো অপারেশনও করেছিলেন।

ক্যাম্পবেল-এর মহিলা গ্রাজুয়েটদের সাবেকি চিকিৎসা প্রথার প্রতি কিছুটা হলেও অনুরক্তি ছিল। হৈমও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁরা পাশ্চাত্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাবেকি চিকিৎসার কিছুটা মিশেল দিয়ে দিতেন। যেমন, দাই বা হাকিম বা কবিরাজদের দেশ থেকে উৎখাত করাই ছিল ব্রিটিশদের সংকল্প। হৈম কিন্তু তাঁর হাসপাতালে দাইদের নিয়েই কাজ করতেন। পথ্য দিতেন 'চুন-মিছরির জল' কিংবা 'মাছের ঝোল-ভাত'।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জেনানা হাসপাতাল খুলে, কঠোর পর্দাপ্রথা বজায় রেখে এদেশীয়দের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। হৈম ওসবের ধার ধারতেন না। কিন্তু দেশীয় নারীদের পর্দাপ্রথার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান দিয়েই তিনি তাঁদের চিকিৎসা করতেন। ফলে ব্রিটিশকে নয়, সমাজের মানুষজন হৈমকেই মাথায় তুলে রাখল।

হাসপাতালে বিপুল কাজের চাপ। তাতে কি রেহাই আছে 'পূজনীয়' স্বামীর হাত থেকে! একের পর এক সন্তান-ধারণ করেই চলেছেন—মোট আটটা—একটি মৃত শিশু প্রসব, দু-টি গর্ভপাত এবং জীবিত পাঁচটি সন্তানকে (চারটি ছেলে, একটি মেয়ে) লালনপালন করা, কঠিন কঠিন আধিব্যাধি সামলানো—এক-এক সময়ে আর পেরে উঠতেন না হৈম, কেমন দিশেহারা লাগত।

দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল দ্বন্দ্ব-বিরোধের যে বিবরণ হৈম দিয়েছেন, তা পড়তে পড়তে আমরা শিরদাঁড়া টানটান করে বসি। সে সময়ের নারীদের আত্মকথায় ফুটে ওঠে এক পূজনীয়, দয়ালু, স্ত্রীর সর্বকর্মে উৎসাহদাতা, সংবেদনশীল 'স্বামী'র রূপ। হৈম এইসব 'কর্তাভজা'দের দলে মোটেই ছিলেন না। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন তাঁর স্বামী সংসারে ফুটো কড়িও ছোঁয়াতেন না; আসলে উপার্জন করার কোনো মুরোদই তাঁর ছিল না। আর ছেলেমেয়েদের দেখভাল করায় হৈমর দিকে একটু সহযোগিতার হাত বাড়ানো—নৈব নৈব চ, তাহলে পুরুষজাতের মানের আর কী রইল! অথচ 'কর্তা' হওয়ার সুবাদে তিনি নির্বিকার চিত্তে হৈমর উপার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করতেন। হৈম ভাবতেন, এ একদিক থেকে ভালোই হল; টাকাপয়সা, সংসার সামলানোর ঝক্কি থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু গোপনে স্বামীকে অমান্য করতেও হৈমর আটকাত না। দরকারি কিছু কেনার জন্য স্বামীর কাছে টাকা চাইলেন, কর্তা হাতের ধাক্কায় উড়িয়ে দিলেন। হৈম প্রাইভেটে যেসব রোগী দেখতেন, তাদের ফি-এর টাকা সবটা তখন আর স্বামীর হাতে তুলে দিতেন না। কিছুটা নিজের কাছে রাখতেন এবং নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতেন। এই আর্থিক স্বাধীনতাটুকু তিনি বেশ উপভোগ করতেন। বউয়ের পয়সায় কর্তালি করার সুযোগ যে পেয়েছে, সেই স্বামীরত্নটি যে, সে যুগের রেওয়াজ মাফিক বউয়ের গায়ে হাত তুলবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? হৈম কোনো পুরুষকেই রেয়াত করেননি; হেনস্থা করতে এলেই ঝেঁটিয়ে সিধে করে দিয়েছেন, কেবল স্বামীর গায়ে হাত তুলতেন না, ধিক্কার দিতেন।

১৯০২ সালে হৈম দ্বিতীয়বার বিধবা হন। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে, এ ছাড়া অগুনতি অন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর বিরাট সংসার। মানুষজন তাঁর কাছে অনাথ, বালবিধবাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিয়ে আসত, তিনি সাধ্যমতো তাদের নিতেন—কাউকে কয়েকদিন, কাউকে কয়েক মাস, কাউকে সারা জীবন। যশোদা নামে এক অনাথ-বালিকা তাঁর আশ্রয়ে এসে বিয়ে করল, বিধবা হল, নিজের মেয়েকে নিয়ে ফিরে গোটা জীবনটাই হৈমর পরিবারে কাটিয়ে দিল। এই বিরাট সংসারের ভার বহন করতে হৈমকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত।

১৯১০ সালে হৈম হাসপাতাল থেকে পদত্যাগ করলেন। এ নিয়ে নানা কথা চালু আছে। একটা কাহিনি এই রকম: হৈম যখন একজন মহিলা-রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন তখন সিভিল সার্জন বিনা নোটিশেই ওই ঘরে ঢুকে পড়েন। হৈম তাকে যারপরনাই বকাঝকা দেন। সার্জন জানান, এ হাসপাতালের তিনিই 'বস', যা খুশি তাই করতে পারেন। হৈম এতটাই রেগে যান যে সার্জনকে সপাটে এক চড় কষান। সিভিল সার্জন হৈমর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। যদিও এ কাহিনির সত্যতা প্রমাণিত নয়। আর একটা হল—একটা অমীমাংসিত মামলায় হৈমর নাম পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ হৈমকে বাধ্য করেছিল পদত্যাগ করতে। যাই ঘটুক না কেন, হৈমর পদত্যাগ একটা রহস্য, কেননা এ বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেননি।

শেষের দিকে হৈমর বিশাল পরিবার—মেয়ে, পালিতা মেয়ে, তাদের ছেলেমেয়েরা; তাঁর বেকার ছেলে ও তার পরিবার, তাঁর ছোটোবোন—যার স্বামী তার ভরণপোষণ চালাতে অক্ষম, আর তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের বহু বিচিত্র আত্মীয়স্বজন। ক্রমশ তাঁর পসার কমে আসছিল, চোখেও তেমন দেখতে পেতেন না। তবু এত বড়ো সংসারটা ওই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে একা হাতে চালাতে হত।

হৈমর ১৯৩৩ সালে স্তন ক্যানসারে মৃত্যু হয়। সে সময়ে তাঁর কী চিকিৎসা হয়েছিল তার কিছুই জানা যায় না। হৈম তাঁর দিনলিপিতে এ বিষয়ে কিছুই লেখেননি।

পরবর্তীতে হৈমবতী সেনের দিনলিপি থেকে তাঁর প্রায় অবিশ্বাস্য জীবন কথার কিছু টুকরো ছবি তুলে ধরার ইচ্ছে রইল।

| লেখকের পেশা: গ্রন্থ সম্পাদনা; প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, অভিধানকার। |

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে : চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও BRCA জিন

ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

হলিউডের লাবণ্যময়ী অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম কে না জানে। তিনি সারা বিশ্বে বারবার আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাঁর এক একটি সুপারহিট সিনেমার মারফত। এহেন সেলিব্রিটি অধুনা আরও বেশি আলোচিত হয়েছেন তাঁর ক্যানসার প্রতিরোধকারী অপারেশন মারফত। চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, যেকোনো নারীর পক্ষে স্তন ও ডিম্বাশয় বাদ চলে যাওয়া দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী হতে পারে। অনেকেই এহেন দুঃসাহসিক (drastic) ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবার পর। সাহসী অ্যাঞ্জেলিনা এহেন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যানসারে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায়। তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যা জীবন হারিয়েছেন স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে।[1] পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল অ্যাঞ্জেলিনা এমন একটি জিন বহন করছেন যাতে তাঁর এ ধরনের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। নারীত্বের পরিচয়-বহনকারী অঙ্গ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন তো বটেই। পরিশেষে সে চিকিৎসার কথা বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করা বোধ হয় আরও সাহসের। এহেন বিরল ও drastic চিকিৎসার খুঁটিনাটি আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চিত্র:১.

অ্যাঞ্জেলিনার সার্জারি

এপ্রিল ২০১৩। অভিনেত্রী ঘোষণা করলেন তাঁর দু-টি স্তনই সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই অপারেশনটির নাম Bilateral Mastectomy। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা নামটি ছোটো করে বলছি BM। প্রথম সার্জারি হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৩। তারপর তিনমাসব্যাপী চলেছে কৃত্রিম স্তন প্রতিস্থাপনের কাজ। একে বলা হয় স্তন পুনর্গঠন (Breast reconstruction)।

মার্চ ২০১৫, মিস্ জোলি (বয়স ৩৯) বিশ্ববাসীকে জানালেন, তাঁর ওভারি এবং ডিম্বনালী দু-টিও তিনি ত্যাগ করেছেন। এই অপারেশনের পোশাকি নাম Bilateral Salpingo Oophorectomy। সংক্ষেপে BSO। তবে তাঁর জরায়ুটি (uterus) বাদ দেওয়া হয়নি। সেটি যথাস্থানেই আছে।

পশ্চাৎকথা (Background Laformation)

স্তনের ক্যানসার আমাদের দেশেও খুব একটা অশ্রুত নয়। ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান মহিলাদের মধ্যে এই রোগ আরও বেশি দেখা যায়। প্রতি আট জনের মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন এই রোগে আক্রান্ত হন তাঁর সম্পূর্ণ জীবদ্দশায়। বেশির ভাগ সময়ই এই রোগ দেখা দেয় মেনোপজের পর। সাধারণভাবে বলতে গেলে ক্যানসার কোনো বংশগত রোগ নয়। তবে কমবয়সে স্তন-ক্যানসার হলে বা পরিবারে একাধিক সদস্যা আক্রান্ত হলে বংশগত যোগসূত্র প্রমাণের একটা প্রশ্ন এসে যায়। এই যোগসূত্রটি স্থাপিত হয় BRCA 1 বা BRCA 2 নামক দু-টি জিনের মারফত। পৃথিবীতে যত BREAST CANCER হয় তার মধ্যে মাত্র ২% হয় এই দু-টি জিনে মিউটেশনের কারণে। এই দু-টি ত্রুটিযুক্ত (Faulty) মিউটেশনে যেকোনো একটি কারও কারও শরীরে থাকলে তাঁর ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। ককেশিয়ানদের মধ্যে প্রতি ৮০০ (আটশো) জনের মধ্যে একজনের শরীরে BRCA জিনের এই ত্রুটিযুক্ত মিউটেশন দেখা যায়। পৃথিবীতে কোনো কোনো প্রজাতির মানুষের মধ্যে এই মিউটেশন আরও বেশি দেখা যায়, যেমন ইহুদি (Ashkenazi Jews)। তবে ভারতীয়দের মধ্যে এর সংখ্যা এখনও কম এবং আমরা একে একটা বিরল সমস্যা হিসাবেই ধরতে পারি। পরিবারে একাধিক সদস্যা যদি স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হন, বিশেষত চল্লিশ বছর বয়সের আগে তাহলে আমরা এই জিনগত ত্রুটির কথা ভাবতে পারি।

স্তন ক্যানসার: শুরুতেই রোগ নির্ণয় (Early detection)

স্তন ক্যানসার একটি মারাত্মক সমস্যা হলেও আমরা এর সঠিক প্রতিরোধ স্ট্র্যাটেজি এখনও জেনে উঠতে পারিনি। পরিবারে কারও এই রোগের ইতিহাস না থাকলেও প্রতিটি নারীর কিছু কিছু সাধারণ সাবধানতা মেনে চলা উচিত। প্রথমত Breast awareness বা স্তন সচেতনতা। ২০ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার করে নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কিছু টিউমার বা অন্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে কি না। একে বলা হয় স্তনের স্ব-পরীক্ষা (Breast Self Examination) বা BSE। পদ্ধতিগত খুঁটিনাটিতে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে এই অতি-সরলীকৃত পরীক্ষায় শুরুর-দশায় সমস্যাগুলো (Early Stage problems) ধরা নাও পড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত ম্যামোগ্রাফি (Mammography)। এটি একটি বিশেষ ধরনের এক্স-রে। চল্লিশ থেকে সত্তর বয়সীদের বছরে একবার করে এই পরীক্ষা করতে বলা হয়। গড়পড়তায় ৮৫% শুরুর দশায় (early stage) ক্যানসার

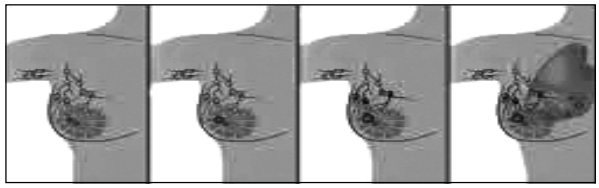

চিত্র:২. স্তন ক্যানসারের বিভিন্ন পর্যায়

এই পদ্ধতিতে ধরা সম্ভব। শুরুর দিকে রোগ নির্ণয়ের (Early Delection) অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ম্যাগনেটিক রেজন্যান্স ইমেজিং (MRI বা Magnetic Resonance Imaging)-এর রোগ নির্ণয় ক্ষমতা ম্যামোগ্রাফির-র চেয়ে আরও বেশি। ব্যায়সাপেক্ষ হলেও BRCA1 বা BRCA2 মিউটেশন বহনকারীদের এই পদ্ধতিতে screening করানো উচিত। যদি কোনো হাই-রিস্ক (High risk) মহিলা তাঁর ক্যানসারের সম্ভাবনা একেবারে কমিয়ে আনতে চান তাহলে তাঁকে ঝুঁকি হ্রাসকারী সার্জারি (Risk-reducing surgery) করাতে বলা হতে পারে।

যেমনটি হয়েছিল, অ্যাঞ্জেলিনার ক্ষেত্রে। তাঁর নিজস্ব বিবৃতি অনুযায়ী, (Strong family history) এবং BRCA1 মিউটেশন বহন করার ফলে তাঁর স্তন ক্যানসারের (Breast Cancer risk) ঝুঁকি ছিল ৮৭% এবং ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের (Ovarian cancer risk) ঝুঁকি ছিল ৫০%। BM অপারেশন-এর ফলে তাঁর ক্যানসার-ঝুঁকি (Cancer risk) ৮৭% থেকে কমে হয়েছে ৫% এবং BSO অপারেশনের ফলে ডিম্বাশয়ে ক্যানসার (ovarian cancer) এর সম্ভাবনা একেবারে নগন্য। স্তন এবং ডিম্বাশয় আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার পরও ওই জাতীয় কিছু কোষকলা (tissue) শরীরে থেকে যায় এবং এই অবশিষ্ট ক্যানসারের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ডিম্বাশয়ে ক্যানসার: শুরুর পর্যায়ে শনাক্তকরণ (Ovarian Cancer: Early Detection)

চিত্র: ৩. মানব শরীরে ডিম্বাশয়ের অবস্থান

স্তন ক্যানসার শুরুর পর্যায়ে ধরে ফেলার জন্য আমরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোনো পরীক্ষার হদিশ দিতে পারিনি। ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। আলট্রাসোনোগ্রাফি ও রক্তে একটি বিশেষ প্রোটিন জাতীয় দ্রব্যের (Ca125) মাত্রা মেপে শুরুর পর্যায়ে ডিম্বাশয়-ক্যানসার নির্ণয় করার একটা চেষ্টা করা হয় কিন্তু এর নির্ধারণ ক্ষমতা বেশ কম।

BRCA জিন মিউটেশন পরীক্ষা কাদের করানো উচিত

হলিউড অভিনেত্রীর জোড়া সার্জারি এবং তৎপরবর্তী মিডিয়ার ঢক্কানিনাদের ফলে সাধারণ মহিলাদের মনে হতে পারে তিনিও BRCA 1 বা 2 মিউটেশন বহন করছেন। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আগেই বলেছি স্তন এবং ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের মধ্যে মাত্র ২%-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত

চিত্র: ৪. জিন তথা DNA-এর ডবল্ হেলিক্স

জিন ধরা পড়ে। বাকি ৯৮%-এর রোগ হয় কোনো শনাক্তকৃত (identifiable) কারণ ছাড়াই এবং পুরোপুরি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। BRCA জিন মিউটেশন পরীক্ষার প্রশ্ন তখনই আসে যখন এই সব ক্যানসার ৪০ বছর বয়সের আগে ধরা পড়ে এবং পরিবারের একাধিক সদস্যা এই রোগে আক্রান্ত হন।

আপনি যদি BRCA1 বা 2 মিউটেশনের বাহক হন, আপনার নিকট-আত্মীয়দের এই মিউটেশন বহন করার সম্ভাবনা ৫০%। নিকট আত্মীয় বলতে যাদের সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের বোঝানো হচ্ছে যেমন ধরুন বাবা, মা, ভাই, বোন, মাসি, মাতামহী এবং পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ আপনার সন্তান-সন্ততি।

পরিবারে যে সমস্ত পুরুষ সদস্য BRCA জিন মিউটেশন বহন করবেন তাঁদেরও বুক ও প্রস্টেট ক্যানসার ঝুঁকি (Breast and Prostate Cancer risk) সামান্য পরিমাণে বেড়ে যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন BRCA1 মিউটেশন বেশি ভয়ংকর, ছেলেদের ক্ষেত্রে BRCA2 মিউটেশন থাকলে ক্যানসারের সম্ভাবনা বেশি; গোটা জীবনে বুকের ক্যানসারের ৫%-১০% ঝুঁকি (5-10% lifetime risk of breast cancer) ।

জোলি গল্পে সাধারণের ভয় পাবার কারণ নেই

একদিকে যেমন ত্রুটিযুক্ত BRCA জিন থাকলে স্তন ক্যানসারের (Breast Cancer) সম্ভাবনা প্রায় ৬৫% বেড়ে যায়; অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে সমস্ত নির্ণীত স্তন ক্যানসারের (diagnosed breast cancer) মাত্র ২% হয় এই জিন বহন করার কারণে। সুতরাং আপামর জনসাধারণের চিন্তিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। পরিবারে একাধিক সদস্যের স্তন বা ডিম্বাশয়ে ক্যানসার না হলে অথবা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে রোগের প্রকাশ না হলে BRCA জিন পরীক্ষারও কোনো কারণ নেই। মিস্ জোলি তাঁর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিজের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো মনে করেছেন তাই করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের ত্রুটি খুঁজে বের করার কোনো অভিপ্রায় এই প্রাবন্ধিকের নেই। তবে জনপ্রিয় সেলিব্রিটিকে অনুকরণ বা অনুসরণ করার প্রয়োজন সাধারণ মানুষের নেই।

চরম ব্যবস্থাগ্রহণ ও ক্যানসার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত (Drastic Measures and Cancer Decisions)

ক্যানসার রোগীর জন্য অনেক সময় অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়ার (Organ Amputation) কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এহেন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও কঠিন। এই পরিস্থিতিতে রোগী/রোগিনীর ব্যক্তিগত পছন্দ/অপছন্দ-এর একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। আর এই ব্যক্তিগত পছন্দ/অপছন্দ ব্যাপারটা তাঁর মানসিকতা যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে (Cultural background) গড়ে উঠেছে তার উপর অনেকটা

নির্ভর করে। আমেরিকার মেয়েরা যেমন Prophylactic Bilateral Mentectomy-র দিকে প্রবণতা দেখান, ফ্রান্সের মেয়েরা আবার প্রমাণিত রোগ ছাড়া, শুধুমাত্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে চান না। চিকিৎসকেরা রোগীর কাছে কীভাবে তথ্য সরবরাহ করছেন সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে রাখতে হবে, নারীর শরীরে স্তনের মতো আর কোনো অঙ্গ তাঁর নারীত্বের বার্তা এত জোরালোভাবে বহন করে না (there is no other organ as connected to feminity, sensuality, sexuality, adulthood and motherhood as the breast)। আর ডিম্বাশয়হীনহীন হয়ে যাওয়া তো অনেকের মতে casstration-এর শামিল। বাইরে থেকে HRT দিয়ে ওভারি (Overy) প্রসূত হরমোনের সরবরাহ স্বল্পদিনের জন্য সম্ভব কিন্তু তারও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক।

আনপেশেন্টের[2] আবির্ভাব
(The Advent of 'Unpatients')

ঝুঁকি থাকা আর রোগ হওয়া কখনো সমার্থক হতে পারে না (A risky condition is not a disease)। Bilateral mastectomy একটি বড়ো সার্জারি (major surgery) যার নিজস্ব সার্জারি সম্পর্কিত জটিলতা (surgery related complication) আছে। তা ছাড়া স্তনের মতো একজোড়া symbolic organ বাদ দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত প্রমাণিত রোগ ব্যতিরেকে কি যুক্তিযুক্ত (justifiable)? এত বড়ো অপারেশনের পরও রোগ তো সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। যেটা হচ্ছে সেটা হল ঝুঁকি কিছুটা কমছে (Risk reduction)। এখানে আশঙ্কার মূল্য (The price of fear) কি বড্ড বেশি হচ্ছে না। পুনর্গঠনের জন্য অপারেশন (Reconstruction surgery) এখন অনেক উন্নত, তাও প্রাথমিক সার্জারিটি তো একটি গুরুত্বপূর্ণ mutilation। রোগের চিকিৎসা যিনি করাতে আসেন তাঁকে সহজেই রোগী বলা যায়। রোগ-প্রতিরোধের জন্য যিনি এসেছেন তাঁকেও না হয় আমরা রোগী বললাম। কিন্তু ঝুঁকি কমানোর (Risk-Reduction) জন্য যিনি এসেছেন তাঁকেও কি আমরা patient বলব না কি 'unpatient' নামক নয়া তত্ত্বের (concept) সঙ্গে তাল মেলাব এবং রোগের বদলে কিছু পরিসংখ্যানগত চিকিৎসা করব; (The benefits are only statistical) unpatient -কে আশ্বস্ত করার জন্য। দেখতে হবে, প্রতিরোধক (preventative) বা ঝুঁকি কমানোর সার্জারি (Risk Reduction surgery) রোগীর জীবনযাপনের মানকে (Quality of life) উন্নত করছে কি না। আর এই ধরনের সার্জারি জনসাধারণের স্তরে (Population Level) কোনো উপকারে লাগছে (benefit) কি না। ব্যক্তি-বিশেষ বা রোগী বিশেষের ঊর্ধ্বে উঠে একেবারে নিরপেক্ষ উপযোগিতার দৃষ্টিকোণে (Neutral Utilitarian Standpoint) দেখলে, দশটি শনাক্তকৃত রোগীর প্রাণ বাঁচানো, দশটি নাম-না-জানা রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রাণ বাঁচানোর সমতুল্য (10 identified lives saved are the equivalent of 10 anonymous lives saved)। আধুনিক সমাজে মানুষ অনেক বেশি ঝুঁকি-বিমুখ (Risk averse) এবং নিয়ন্ত্রণপ্রবণ (control-prone) হতে চান। প্রশ্ন হল, চিকিৎসক হিসাবে আমরা কি মাত্রাছাড়া চিকিৎসাক্রিয়ার মাধ্যমে এর উত্তর বা বাড়তি-উত্তর দেব? (do we answer or over-answer with more than proportionate actions)?

সার্জিক্যাল মেনোপজ

নারীদেহে ডিম্বাশয় (overy) দু-টির কাজ বহুবিধ। ডিম্বাণু সংরক্ষণ, উৎপাদন থেকে শুরু করে Estrogen, Progesterone এবং Testosterone হরমোন সরবরাহ করা ইত্যাদি। এই হরমোনগুলি শরীরে নানারকম কাজ করে। যেমন, স্তনবৃদ্ধি (Breast development), নিয়মিত ঋতুস্রাব, হাড় এবং ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা (maintaining bone & skin health)। ওভারিগুলি যখন তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেয়, তাকে বলা হয় মেনোপজ। বেশিরভাগ মহিলার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে ৫০ বছর বয়সের আশেপাশে। এই অবস্থায় মাসিক ঋতুচক্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

সার্জারি মারফত যখন দু-টি ওভারি-ই বাদ চলে যায় তাকে বলা হয় সার্জিক্যাল মেনোপজ। স্বাভাবিক মেনোপজ একটা ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া কিন্তু সার্জিক্যাল মেনোপজ ঘটে আকস্মিকভাবে (Natural menopause is a gradual process but surgical menopause happens abruptly) ফলে, মেনোপজের নানারকম উপসর্গ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে। শুধু তাই নয় হাড় (Bones) এবং হৃৎপিণ্ডের (Heart) উপর Estrogen হরমোনের যে সুরক্ষা প্রভাব (Protective effects) থাকে সেগুলি চলে যাবার ফলে মেনোপজের পর মহিলাদের অস্থি-ভঙ্গুরতা (Osteoporosis) এবং হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার (Heart Attack)-এর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অনেক সময় কৃত্রিম হরমোন সরবরাহ করা হয়, যাকে বলা হয় হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা (Hormone Replacement Therapy) বা HRT। মুশকিল হল, HRT সাময়িকভাবে মেনোপজ-উপসর্গ (menopausal symptoms) যেমন গরমের হলকা লাগা (hot flush), রাতে ঘাম হওয়া (night sweats), মেজাজের ওঠাপড়া (mood disturbances) ইত্যাদির উপশম করলেও দীর্ঘকাল (long term) ব্যবহারে হৃদ্‌রোগ, স্তন ক্যানসার (Breast Cancer) এবং Thrombosis সম্ভাবনা সামান্য হলেও বাড়িয়ে দেয়। তাহলে প্রশ্ন হল কম বয়সে মেনোপজে পৌঁছে গিয়ে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের (Ovarian Cancer) ঝুঁকি (risk) কমল ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে বিপদ বাড়ল না তো?

পেশেন্ট অটোনমি-ই কি শেষ কথা?

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীর সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক অনেক পালটেছে। প্রচলিত আমি-বলব-তুমি-শুনবে গোছের paternalistic approach থেকে বেরিয়ে এসে আমরা রোগীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (patient centred approach) নিয়েছি। চিকিৎসাকর্মীর দায়িত্ব রোগীর বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত তথ্য পেশ করা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য-এর অভাব থাকলে সেটাও রোগীকে সরাসরি জানানো। যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ (Intervention) ওষুধ বা পদ্ধতি (Procedure) প্রয়োগ করতে চাইলে তার খুঁটিনাটি (Pros and Cons) আগে রোগীকে জানানো বাধ্যতামূলক। এই সমস্ত তথ্য/জ্ঞানের (information/knowledge) ভিত্তিতে বিভিন্ন বিকল্প (option)-এর মধ্যে রোগী নিজের জন্য যেটিকে সেরা মনে করবেন সেটি বেছে নেবেন। রোগীর স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকারকেই বলা হয় পেশেন্ট অটোনমি। এর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা

(advantage) হল এটি বস্তাপচা paternalistic approach)-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শরীর-যার-সিদ্ধান্ত-তার তত্ত্বের জয়গান গায়। অন্যদিকে এটি স্ব-চিকিৎসা পরিষেবাকে (selfservice treatment) প্রশ্রয় দিতে পারে। সমস্যা আরও জটিল হয় যখন রোগী তথ্যগুলোকে ভুল বা অসম্পূর্ণভাবে বুঝে নিজে সিদ্ধান্ত নেন (patient takes decision based on false or incomplete comprehension of information)। অতি সরলীকৃত মনে হলেও, যেকোনো জটিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কয়েকটি ধাপ মেনে চলা উচিত। প্রথমটি হল নানা বিকল্পের মধ্যে কোনটাতে কম ঝুঁকি-বেশি উপকার তার মূল্যায়ন (risk benefit assessment of different options)। দ্বিতীয়টি কিছু না করা, চিকিৎসা করার আগে রোগটার জন্য অপেক্ষা করা (do nothing and wait for the disease before treating)। তৃতীয়টি সম্ভব হলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া (prevention if possible) এবং সর্বশেষ পন্থা হল ঝুঁকি কমানো (Risk reduction)। আসলে এই ধরনের হাজারো প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ঠিক বা ভুল উত্তর হয় না। পুরো বিষয়টিই যেন আপেক্ষিক। আর সেজন্যই চিকিৎসার নৈতিক বিধি (Medical ethics) নামক বিষয়টি এত কৌতূহলোদ্দীপক।

পেশেন্ট অটোনমির একজন আন্তরিক সমর্থক হয়েও এক এক সময় আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। পাঠকদের সামনে এরকমই একটি প্রশ্ন রেখে এই প্রবন্ধের ইতি টানব। মনে করুন আপনি একজন চিকিৎসক। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আপনাকে বললেন তাঁর অণ্ডকোষ দু-টির আর প্রয়োজন নেই এবং এতে ক্যানসার হবার আশঙ্কায় তিনি ঘুমোতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছা ও দু-টি বাদ দিয়ে দেওয়া। আপনি কি তাঁর অনুরোধ সমর্থন করবেন?

[1] তাঁর মা Macheline Betrand, cousin sister Francina, মাসি Debbie এবং great aunt Stella মারা গিয়েছিলেন স্তন-ক্যানসারে। মাতামহী Lois এবং Great grand mother/ তস্যমাতা জীবন হারিয়েছিলেন ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে।

[2] রোগী নয় কিন্তু রোগ সম্ভাবনায় আশঙ্কাগ্রস্ত।

| ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এফ আর সি ও জি, স্ত্রীরোগে-বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। |

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহণ ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন: ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন: ৯০৮৮০৫০৫২৫

টিকাকরণের ইতিহাস

টিকাকরণ রোগ ঠেকায়। মানুষ কেমন করে প্রথম জানতে পারল টিকার কথা? কেমন ছিল প্রথম টিকা? কোন সর্পিল বন্ধুর পথ বেয়ে আজ টিকা আমাদের অপরিহার্য বন্ধু হয়ে উঠেছে? লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

বিবর্তনের ইতিহাস বলে ৪৫০০০ লক্ষ বছর আগে তৈরি হয়েছিল পৃথিবী। প্রথম জীবনের সৃষ্টি ৩৫০০০ লক্ষ বছর আগে, স্থলে প্রথম উদ্ভিদের আগমন ৪৫০০ লক্ষ বছর আগে আর প্রথম স্তন্যপায়ী পৃথিবীতে এসেছে ২০০০ লক্ষ বছর আগে। সেই তুলনায় বর্তমান মানুষের বয়স মাত্র ২৫০০ লক্ষ বছরেরও কম। অথচ আজ মানুষই পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসে আছে। সে বেঁচে আছে অন্য প্রাণীদের হারিয়ে, ধ্বংস করে। নিজের বুদ্ধির জোরে আজ সে শাসন করছে পৃথিবী।

পৃথিবী এক বধ্য ভূমি। এখানে নিরন্তর হত্যাকাণ্ড চলছে। বনে বাঘ মারছে হরিণকে, মানুষ মারছে বাঘকে, এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিকে মারছে, সে খাবার জন্যে হোক বা আত্মরক্ষার জন্যে হোক, বা অকারণে হোক। নিরন্তর এই মারামারি চলছে। এর মধ্যে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে, কৌশল দিয়ে অন্যদের হারিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, বংশ বিস্তার করে চলেছে। তাই আজও সে টিকে আছে এবং আজও অন্যদের হারিয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ নিজেই নিজেদেরকে বলছে অমৃতের পুত্র! অথচ এই পুত্রকে জন্ম নিতে হচ্ছে এক শত্রু পরিবেষ্টিত পৃথিবীতে। যত দিন সে মায়ের জঠরে ছিল, মা তাকে খাইয়েছে, রক্ষা করেছে ঠান্ডা গরম থেকে, রক্ষা করেছে অন্য শত্রুদের থেকে। যখনই সে জন্ম নিল, তখন থেকেই সে একেবারে অসহায়। মাতৃগর্ভের তুলনায় ঠান্ডা পৃথিবী, খাবার সমস্যা, আর বাইরের নানা রোগ জীবাণুর ঘেরা চক্রব্যূহে একা সে অভিমন্যু। তার জন্মদাতারা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। তাকে উষ্ণতা দিল, খাবার দিল, আর রোগ জীবাণু থেকে বাঁচার জন্যে তাকে যথা সম্ভব অস্ত্র তুলে দিল। এই রোগ জীবাণুর কারও নাম ব্যাকটিরিয়া, কারও নাম ভাইরাস, কারও নাম ছত্রাক . . . আরও কত কী। আর এই অস্ত্রের নাম টিকা—মানব সন্তানকে রক্ষা করার বর্ম। শত্রু অনুযায়ী এই অস্ত্রও বিভিন্ন। যেন মহাভারতের যুদ্ধে অস্ত্রগুরু গাণ্ডিব ধরিয়ে তূণীরে তির ভরে দিয়ে তাকে জীবনযুদ্ধে নামিয়ে দিল। আশীর্বাদ করে বলল—জয়তু ভবঃ, অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ কর। মানব সন্তান যে যে অস্ত্র পেল তাই নিয়েই এগিয়ে চলল।

সময়ের যে সন্ধিক্ষণে এই অস্ত্র লাভের সাধনা শুরু, তখন বিজ্ঞান ছিল লক্ষ যোজন পিছিয়ে এবং তার কারিগরি যন্ত্রপাতিও মানুষের আয়ত্তে ছিল না। তাই তখন শত্রু কে জানা যায়নি, জানা যায়নি তাকে ধ্বংস করার পদ্ধতিও। ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি নামগুলো এসেছে অনেক পরে।

এ যেন মেঘের আড়াল থেকে অজানা শত্রুরা বাণ নিক্ষেপ করে চলেছে—আর মানুষ যেকোনো উপায়ে তার কাছ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ যতই সিদ্ধিলাভ করেছে, ততই তার কাছে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে মানুষ নামক এই আজব শরীরের রহস্য। উন্মোচিত হয়েছে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি রহস্য, আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সৈনিক কোষ, যা মানুষকে রক্ষা করে চলেছে। মানুষ নিজেকে, নিজের শরীরকে রক্ষা করার জন্যে চক্রব্যূহ বানিয়ে তার চারপাশে কয়েক স্তরে সাজিয়ে দিয়েছে শত্রু ধ্বংসকারী সৈনিক—বিভিন্ন ধরনের কোষকে বা রাসায়নিক পদার্থকে—যা আমরা পরে জেনেছি। সে আলোচনায় পরে আসব।

আপাতত সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে যাই সেই শুরুতে, যেখানে বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা অজ্ঞ মানুষ মেঘের ওপারে থাকা শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজছে। খুঁজছে পাশুপত অস্ত্র। আর একদিন সত্যিই সে এক অস্ত্র খুঁজে পেল। যদিও সেই মুহূর্তে জানল না শত্রু কে, জানল না অস্ত্র কীভাবে কাজ করে। তবুও সে খুঁজে পেল বাঁচার পথ।

কীভাবে এই অস্ত্র কাজ করে, কত রকমের অস্ত্র আজ মানুষের হাতে এসেছে, সেসব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। আপাতত কীভাবে এই পাশুপত মানুষের হাতে এল, কেই বা এর আবিষ্কারক, সেসব নিয়েই আমাদের আলোচনা—ফিরে দেখা।

গুটি বসন্তের টিকা

যেকোনো বিষয় নিয়ে বলতে গেলেই মনে হয়, ঘুরে আসি না ইতিহাসের কাল থেকে একবার! আর ঘুরতে গেলেই মণিমাণিক্যে ভরে যায় কাঁধের ঝুলি। কে জানত, টিকা আবিষ্কারের প্রবাদপুরুষ এডোয়ার্ড জেনারের জন্মের বহু বহু বছর আগে থেকেই টিকাকরণ প্রথা চালু ছিল? কে জানত গুটি বসন্তের চিকিৎসা হত রোজ বারো বোতল বিয়ার খাইয়ে? কে জানত সুলতানদের হারেমের সুন্দরীরাও এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এমনি কত যে মুক্ত লুকিয়ে থাকে ছাইয়ের মধ্যে! সময়ের ছাই। ওড়ালেই মানিক রতন। চলুন, একটু দেখে আসি . . .

টিকা আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে কতকগুলো মারণ রোগ, যারা একসময় মনুষ্য জাতিকে বার বার চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে, অকারণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আর অস্তিত্বের সংকটে থাকা মানুষ তাদের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছে, মুক্তি চেয়েছে। সেই বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেছে সেই সব রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-রোগের মারণবাণ!

টিকা আবিষ্কারের সঙ্গে যেসব রোগের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তারা হল গুটি বসন্ত বা স্মল পক্স (small pox) প্লেগ, কলেরা, ইয়োলো ফিভার ইত্যাদি। তবে এদের টিম লিডার হল গুটি বসন্ত।

গুটি বসন্ত (Small pox) বর্তমান মানুষ পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দিতে পেরেছে। বর্তমান যে চিকেন পক্স হয়, অনেকটা সে রকম, কিন্তু গুটিগুলো ছোটো হত আর এই রোগ ছিল প্রাণঘাতী।

এই গুটি বসন্ত কতদিন থেকে মানুষকে আক্রমণ করে আসছে সে ইতিহাস অজানা। কিন্তু ধরে নেওয়া হয়, এই রোগ প্রাগৈতিহাসিক। ১০,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দেও এই রোগ ছিল। মিশরের সম্রাট ফারাও রামসেস ৫ (Pharao Ramses-V), যিনি ১১৫৬ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে মৃত্যু বরণ করেন, তার মমিকৃত মাথায় নিশ্চিতভাবে গুটি বসন্তের দাগ পাওয়া গেছে। প্রাচীন চিনে ১১২২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বিবরণীতে যেমন এর উল্লেখ আছে, তেমনি ভারতবর্ষেও এর অস্তিত্ব ছিল। মনে করা হয় আফ্রিকাই এর ধাত্রী ভূমি। সেখান থেকে, বিশেষত মিশরীয় বণিকদের ও দাসদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এর বিস্তার ঘটে।

মেক্সিকোর অ্যাজটেক (Aztec) সাম্রাজ্য সম্পূর্ণটাই মহামারীর কবলে পড়ে। ১৫১৯ সালে স্প্যানিশরা অ্যাজটেক আক্রমণ করার পরেই এই রোগ শুরু হয়। সাম্রাজ্যের ২৫ শতাংশ লোকই মারা যায়, আক্রান্ত হয় আরও বহুগুণ লোক। এই রোগের হাত থেকে তখন বাঁচার কোনো উপায়ই জানা ছিল না, তাই গুটি বসন্ত একটা সাম্রাজ্য ও সভ্যতাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে।

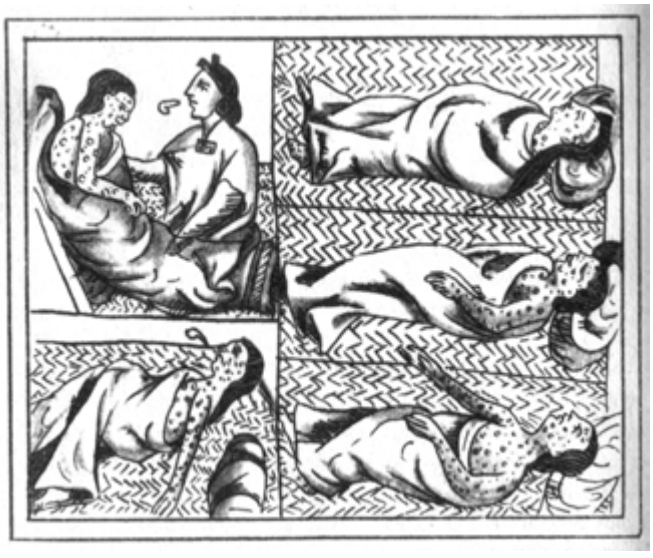

চিত্র: ১. অ্যাজটেক চিত্রতে গুটি বসন্ত ও তার পরিণতি

অতীতে বারবার গুটি বসন্ত মহামারীর আকার নিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্য পতনের সময় (১০৮ খ্রি.) ভয়ংকর মহামারী (Plague of Antinine)-তে প্রাণ হারান ৭০ লক্ষ মানুষ। এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রতি বছর ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হত গুটি বসন্তে। এই রোগ এতই প্রাণঘাতী ছিল, যে জীবাণু-যুদ্ধেও এর ব্যবহারের কথা ভেবেছেন অনেক সমরনায়ক। ছোটোদের ক্ষেত্রে ৮০-৯০ শতাংশে আক্রান্তের মৃত্যু হত, বড়োদের ক্ষেত্রে ২০-৬০ শতাংশ।

৫৭০ সালে সুইজারল্যান্ডের বিশপ মারিয়াস (Bishop Marius) এর নাম দেন 'Variola' যার অর্থ চামড়ার দাগ (stained) অর্থাৎ গুটি বসন্ত হলে চামড়ায় স্থায়ী দাগ হয়ে যেত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে এর নামকরণ হয় small pockes (Pockes মানে থলি)। সিফিলিসকে বলা

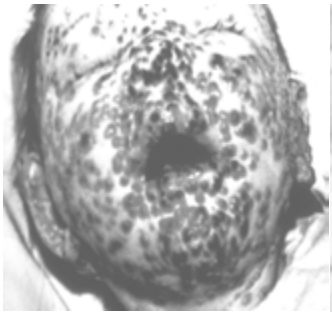

চিত্র: ২. বছর বয়স শিশুর মারণ গুটি বসন্ত চিত্র: ৩. বাচ্চার মুখে ভয়াবহ গুটি বসন্ত

হত Great pokes সম্ভবত সেই থেকে এই রোগের ভাইরাসকে বলা হয় Variola আর ইংরাজিতে এই রোগকে বলা হয় Small pox.

নাম যাই হোক না কেন, এ যেন ড্রাগনের মতো বার বার মনুষ্যজাতিকে তাড়া করেছে। মানুষ পরাজিত হতে চায়নি, এর হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে—আর উপায় খুঁজেছে কী করে মুক্ত হওয়া যায়? আর সেই মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে এক সময় আবিষ্কার করে ফেলেছে একে প্রতিরোধের বর্ম—'টিকা'।

আগে যারা আক্রান্ত হত তাদের চিকিৎসাও করা হত বিভিন্নভাবে। তখন বিজ্ঞান এগোয়নি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ধারণা অনুযায়ী নিদান দিয়েছেন। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপ হয়েছে বেশি।

কেউ জিভ কেটে দূষিত রক্ত বের করে দিয়ে মুক্তির নিদান দিয়েছেন, কেউ রোজ ১২ বোতল বিয়ার খেতে বলেছেন, কেউ আবার ইউরোপের মতো ঠান্ডা জায়গায় জানলা দরজা খোলা রেখে ঘরে আগুন না জ্বেলে এর চিকিৎসা করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক ছিলেন টমাস সিডেনহাম। তিনি সেই সময়ে এই রোগের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার এক ডাক্তারি পড়া ছাত্র টমাস ডোভারের গুটি বসন্ত হয়। সিডেনহাম কীভাবে তার চিকিৎসা করেছিলেন, সে কথা ডোভারের মুখেই শোনা যাক। ডোভার লিখেছেন—

''Whilst I lived in Dr Sydenham's house, I had myself the Small Pox, and fell ill on the Twelfth Day. In the beginning I lost twenty two Ounces of Blood [from bloodletting]. He gave me a Vomit, but I find by Experience Purging much better. I went abroad, by his Direction, till I was blind, and then took to my Bed. I had no Fire allowed in my Room, my Windows were constantly open, my Bed-Clothes were ordered to be laid no higher than my Waste. He made me take twelve Bottles of Small Beer, acidulated with Spirit of Vitriol, every twenty Four hours. I had of this Anomalous Kind [of small pox] to a very great Degree, yet never lost my Senses one Moment.''

পরবর্তীকালে ডা. সিডেনহাম নিজেই লক্ষ করেছিলেন, যে সব অবস্থাপন্ন লোকেরা এই ধরনের চিকিৎসা পেয়েছে তাদের মধ্যে মৃত্যু হার যারা গরিব বা চিকিৎসা পায়নি তাদের থেকে বেশি। কাজেই এই চিকিৎসায় উলটো ফলই হয়েছে।

চিত্র: ৪. সে সময়ে গুটি বসন্তের চিকিৎসা

ভ্যারিওলেশন

তারও অনেক আগে মানুষ এই রোগের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে। দেখেছে যারা একবার আক্রান্ত হয়, তারা আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয় না। আর এর থেকেই মানুষকে অল্প আক্রান্ত করে বড়ো আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় বেরও করেছে। কিন্তু কে কবে প্রথম সেই চিন্তা করেছিল বা প্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল, সে সবের কোনো ইতিহাস নেই। তা ইতিহাসের গর্ভে তলিয়ে গেছে। তবে আমরা জানি কী ছিল সেই উপায়।

সে উপায় হল, গুটি বসন্তের গুটি থেকে রস নিয়ে বা শুকিয়ে যাবার পর শুকনো চামড়া (scab) গুঁড়ো করে সুস্থ লোকের নাকের মধ্যে দেওয়া বা চামড়ায় ক্ষত করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতিকে বলা হত variolation। এর ফলে কেউ কেউ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত, তবে যারা বেঁচে থাকত, তারা এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পেত।

চীনে দশম শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে এমনকী আরও ২০০০ বছর আগে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলে বিশ্বাস। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ও তুরস্কেও এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এর বিস্তার লাভ ঘটে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

পরে আরও একটু উন্নত হয় পদ্ধতি। গুটি থেকে পাকা পুঁজ বা রস নিয়ে ল্যান্সেটের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেওয়া হত চামড়ার মধ্যে। তখন তাকে বলা হত inoculation। পরে Vaccination ও Inoculation একই অর্থে ব্যবহার করা হত।

ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতি হয়। লোকের চলাচল ঘটে দেশ থেকে দেশান্তরে। শুরু হয় দাস ব্যাবসা। আর লোকের চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও বিস্তার শুরু হয়।

ইউরোপে এই রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ দাস ব্যাবসা। আফ্রিকার দাসেরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়।

কটন মাথার (Cotton Mather) ছিলেন আমেরিকার বস্টনের মন্ত্রী, ও বিশিষ্ট ধর্মযাজক। তিনি একজনের কাছ থেকে ওনিসিমাস (Onesimus) নামের এক লিবিয়ান দাস উপহার হিসেবে পান, যার গায় ছিল ভ্যারিওলেশানের ঘায়ের ক্ষত। মাথার ছিলেন শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আগ্রহী। তিনি অন্য লোকের কাছ থেকে এই Variolation বিষয়ে জানতে পারেন, খোঁজ নিয়ে দেখেন, আফ্রিকা থেকে আগত অনেক দাসেরাই গুটি বসন্তের হাত থেকে বাঁচতে Variolation করিয়েছে। মাথারের তিন সন্তান ও দ্বিতীয় পত্নী হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার পর মাথার গুটি বসন্তসহ অন্য রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

চিত্র: ৫. কটন মাথার

তার আগে ১৬৯৪ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের রানি মেরী-২ (Queen Merry-II) গুটি বসন্তে মারা যান। ১৫৪৫ সালে ভারতের গোয়ায় ৮০০০ শিশু মৃত্যু ঘটে। ১৭২১ সালে বস্টনের ১২০০০ নাগরিকের অর্ধেক গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। ১৭৩৬ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ৪ বছরের ছেলের মৃত্যু ঘটে গুটি বসন্তে। লন্ডনে ১৭৫১ সালে গুটি বসন্তে মারা যায় ৩৫৩৮ জন লোক। এই আক্রমণাত্মক ও ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে ১৭৫৯ সালের ১৭ই মে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এডোয়ার্ড জেনার, যিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত হবেন। তার গল্পে পরে আসছি। এবার একটু হারেমের গল্পে যাই।

বিভিন্ন দেশের সুলতানেরা সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে তাদের হারেমে রাখতেন। তুরস্কের ইস্তানবুলের Ottoman সাম্রাজ্যের সুলতানদের পছন্দ ছিল সেখানকার ককেসাস জনজাতির অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের। কিন্তু গুটি বসন্তে আক্রান্ত মুখে দাগ ভর্তি সুন্দরীদের আর কার ভালো লাগে? তাই সুলতান সেই অঞ্চলের মেয়েদের ছোটো বেলাতেই ধরে ধরে Variolation করিয়ে দিতেন। এতে যারা মারা যাবার তারা মারা যেত, কিন্তু যারা বেঁচে থাকত, তাদের আর ভবিষ্যতে গুটি বসন্ত হত না। তাদের মুখশ্রী সুন্দর থাকত। এই ইস্তানবুল থেকেই Variolation পদ্ধতি ইউরোপে পৌঁছোয়। সেও আরেক গল্প।

তৎকালীন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট অভিজাত মহিলা ছিলেন লেডি মেরী ওর্টলে মন্টেগু। ১৭১৫ সালে গুটি বসন্তে তার সুন্দর মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তার ২০ বছরের ছেলেও এই অসুখে মারা যায়। ১৭১৭ সালে লেডি মেরীর স্বামী এডোয়ার্ড মন্টেগু ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হয়ে ইস্তানবুলে যান। সেখানে গিয়ে লেডি মন্টেগু এই Variolation পদ্ধতি বিষয়ে অবগত হন এবং গুটি বসন্তের হাত থেকে বাঁচাতে ১৯১৮ সালে দূতাবাসের ডাক্তার চার্লস মিটল্যান্ডকে তার ৫ বছরের ছেলেকে variolation করার নির্দেশ দেন। এটাই প্রথম পেশাদারি Variolation পদ্ধতি। পরে চার্লস মিটল্যান্ডকে রাজার পক্ষ থেকে ভ্যারিওলেশন করার লাইসেন্স দেওয়া হয়। এর কার্যকারিতা দেখার জন্য ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত করা হয় কিছু

চিত্র: ৬. গুটি বসন্তের ভয়াবহ রূপ

কয়েদিদের। বলা হয়, যারা ট্রায়াল দিতে রাজি হবে, তারা বিশেষ সুবিধা পাবে। অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ট্রায়াল দেওয়া হয় এবং দেখা যায়, যাদের ভ্যারিওলেশন করা হচ্ছে, তাদের আর পরে গুটি বসন্ত হচ্ছে না। অবশেষে ১৭২২ সালে প্রিন্সেস অফ ওয়েলসের দুই কন্যার উপর এটি প্রয়োগ করা হয়, এবং এই পদ্ধতি সামাজিক স্বীকৃতি পায়।

চিত্র: ৭. রাণি মেরী গুটি বসন্তে মারা যান

লেডি মন্টেগু, গুটি বসন্তে আক্রান্ত হবার পর, ইস্তানবুল থেকে ইংল্যান্ডে 'ভ্যারিওলেশন' পদ্ধতি আমদানি করেন।

এর মধ্যে আরেকবার আমেরিকার বস্টনে ঘুরে আসতে হবে। ১৭২১ সাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে জাহাজে করে গুটি বসন্তে আক্রান্ত কিছু অসুস্থ মানুষ এসে নামল বস্টনে। বস্টনে শুরু হল মহামারী। এবারও সেই কটন মাথার এই রোগের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতে Variolation করার কথা বললেন, কিন্তু শুধুমাত্র Dr. Zabdiel Boylston ছাড়া অন্য কাউকেই Variolation করাতে রাজি করাতে পারলেন না। যাদের Variolation করানো হল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আক্রান্ত হল, ফলে মাথার ও ডাক্তার বয়েলস্টোন-এর উপরও নেমে এল আক্রমণ। 'কুকুর' বলে গালাগালি দিয়ে মাথারের বাড়িতে বোম মারা হল। পরে অবশ্য মাথার ও ডা. বয়েলস্টোন তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মহামারীতে যেখানে মৃত্যুর হার ১৪ শতাংশ, সেখানে ভ্যারিওলেশন করা হলে মাত্র ২ শতাংশ লোক মারা যায়। পরে মাথারের দাবি স্বীকৃতি পায় এবং আমেরিকায় Variolation জনপ্রিয় হয়।

এমনকী, ১৭৬৬ সালে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়ার জন্যে আমেরিকার সুস্থ সৈনিকের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিটিশদের হাত থেকে কুইবেক দখল করতে পারেননি। সেই সময় সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্যদের Variolation করা হত। অবশেষে জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৭৭ সালে আমেরিকার সৈন্যদের Variolation করার নির্দেশ দেন। এভাবে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড এবং তারপরে সারা পৃথিবীতেই Variolation জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এডোয়ার্ড জেনার ও ভ্যাক্সিনেশন

এই অবস্থার মধ্যে ১৭৫৭ সালে ৮ বছরের এক বালককে Variolation বা Inoculation করা হয়, যার নাম এডোয়ার্ড জেনার। এঁর গল্প না বললে টিকার ইতিহাস বলাই হয় না। কারণ এঁর হাত ধরেই Variolation বা Inoculation আজ টিকা বা vaccine হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

চিত্র: ৮. এডোয়ার্ড জেনার।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি, দু-একজন থাকে সব বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহী ও জানতে আগ্রহী। আমাদের চোখে কিছুটা খ্যাপাটে তো বটেই। জেনারও সেই রকম একজন ছিলেন। প্রায় একই সঙ্গে মা-বাবাকে হারিয়ে ৫ বছর বয়সেই অনাথ হয়ে দাদার কাছে আশ্রয় নেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নানা নামকরা ডাক্তারের চেলাগিরি করেছেন—এতে তাঁর জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি ডাক্তারি বিষয়েও উৎসাহ পেয়েছেন।

১৩ বছর বয়সে যখন তিনি এক গ্রাম্য সার্জেনের সহকারী, তখন একজন গোয়ালিনী ডাক্তারকে বলল 'আমার কখনো গুটি বসন্ত হবে না, কারণ আমার কাউ পক্স (গো বসন্ত) হয়ে গেছে। আমার মুখে কখনো আর ওই কুৎসিৎ দাগ হবে না'। কাউ পক্সও (Cow Pox) এক ধরনের বসন্ত, যা সাধারণত গোরু বা ঘোড়াদের হত। মানুষের হলেও এর তীব্রতা কম হত, কেউ মারা যেত না। কথাটা জেনার শুনলেন এবং তার মনের কোথাও স্থায়ী ভাবে রয়ে গেল।

এরপর তিনি বিখ্যাত সার্জেন জন হান্টারের কাছে শিক্ষানবিশি

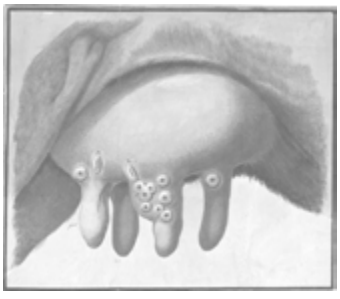

চিত্র: ৯. গোরুর বাঁটে কাউপক্স (রেখাচিত্র) চিত্র: ১০. গোরুর বাঁটে কাউপক্স (আলোকচিত্র)

করলেন। জড়িয়ে পড়লেন নানা কাজে। কখনো হাইড্রোজেন বেলুন বানিয়ে ১২ কিলোমিটার ওড়ালেন, কখনো কোকিলের ডিমে তা নিয়ে গবেষণা

করলেন, কখনো পরিযায়ী পাখিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সময় কাটালেন। আবার তিনি কখনো মাতলেন প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে। একজন দক্ষ সার্জেনও হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার মাথার মধ্যে কোথাও থেকে গেল সেই গোয়ালিনীর কথা।

তিনি দেখলেন যে মানুষ শুধু পশুর কাছ থেকেই কাউ পক্সে আক্রান্ত হয় না, একজন মানুষের থেকেও আরেক জন মানুষের কাউ পক্স হতে পারে। অবশেষে ১৭৯৬ সালে পেয়ে গেলেন সারা নিলমকে।

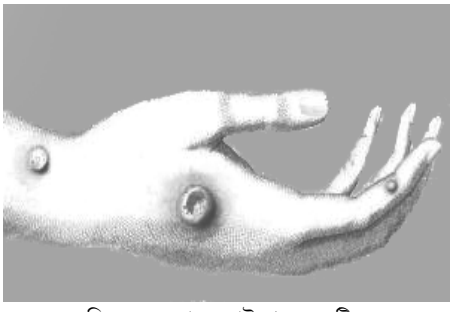

চিত্র: ১১. হাতে কাউ পক্সের গুটি

সারা নিলমের হাতে কাউ পক্সের গুটি ছিল—সেখান থেকে রস নিয়ে তিনি ৮ বছরের বালক জেমস ফিপসের (James Phipps) চামড়ায় ঢুকিয়ে দিলেন।

প্রথম কয়েকদিন হালকা জ্বর, গায় ব্যথা হলেও জেমস সেরে উঠল। এর দু-মাস পরে জেনার একজনের গুটি বসন্তের রস নিয়ে আবার জেমসের চামড়ায় ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন, জেমসের গুটি বসন্ত হল না। ল্যাটিন ভাষায় গোরুকে বলে Vacca, আর কাউ পক্সকে বলে Vaccinia। তাই জেনার এই পদ্ধতিকে বললেন Vaccination। সেই থেকে আজও চলছে এই কথা। জন্ম নিয়েছে নতুন শব্দ। আমরা যাকে 'টিকা' বলি।

চিত্র: ১২. জেমস ফিপস—ডা. এডোয়ার্ড জেনার-এর প্রথম কাউপক্স ভ্যাকসিন পেয়েছিলেন।

জেনার তার পরীক্ষালব্ধ ফল পাঠালেন রয়াল সোসাইটিকে-তারা প্রত্যাখ্যান করল। শেষে জেনার নিজেই তিন ভাগে প্রকাশ করলেন তার গবেষণা। তারপর লন্ডনে গেলেন ভলান্টিয়ার জোগাড় করার জন্যে, কিন্তু কাউকেই পেলেন না।

চিত্র: ১৩. জেনার তাঁর পদ্ধতিতে 'ভ্যাক্সিনেশন' করছেন

চিত্র: ১৪. তীক্ষ্ণ ল্যান্সেটের সাহায্যে ভ্যাক্সিন দান

হতাশও হলেন না। কয়েকজন ডাক্তার জেনারের কাছ থেকে টিকার রস নিয়ে তাদের রোগীদের ওপর প্রয়োগ করলেন এবং ভালো ফল পেলেন। ধীরে ধীরে বাড়ল প্রচার, জনপ্রিয়তা এবং কমতে থাকল গুটি বসন্ত।

জেনার কিন্তু আর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গেলেন না। তিনি মন দিলেন টিকাকরণে। নিজের বাড়ির বাগানে একটি ছোট্ট কুঁড়ে বানিয়ে গরিবদের বিনা পয়সায় টিকাকরণ করতেন। সেই ঘরের নাম দিলেন Temple of Vaccinia। 'টিকার মন্দির'। নিজেকে সরিয়ে নিলেন প্রচারের বাইরে, কাজের মধ্যে।

চিত্র: ১৫. এডোয়ার্ড জেনার-এর 'ভ্যাক্সিনিয়া মন্দির'

১৮১০ সালে তার বড়ো ছেলে এবং ১৮১৫ সালে তার স্ত্রী যক্ষাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর তিনি নিজেকে আরও গুটিয়ে নিলেন। অবশেষে ১৮২৩ সালে স্ট্রোকে জেনারের মৃত্যু হয়। ৭৪ বছরের জীবন শেষ হয় মানব কল্যাণে। গুটি বসন্ত থেকে মনুষ্য জাতিকে মুক্তি দিতে এবং পরবর্তী কালে আরও অনেক রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে তিনি পথ দেখিয়ে গেলেন। তাঁর এই বিষয়ে কতটা আকুতি ছিল, তা ধরা পড়ে তার লেখা ডায়রির পাতায়—'the anihilation of the small pox, the most dreadful scourge of the human species, must be the final result . . .

আর একজনের কথা, যিনি চেষ্টা করলে হয়তো জেনারের জায়গা নিতে পারতেন, তিনি বেঞ্জামিন জেস্টি (Benjamin Jesty 1737-1816)

চিত্র: ১৬. বেঞ্জামিন জেস্টি

জেস্টি ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন কৃষক এবং পশু প্রজননকারী। তাঁর নিজের কাউ পক্স হয়েছিল। যখন তার গ্রামে গুটি বসন্তের আক্রমণ শুরু হল, তখন তিনি কাউ পক্স থেকে রস নিয়ে তার নিজের সন্তান ও স্ত্রীকে স্রেফ মনের জোরে টিকাকরণ করেছিলেন। তিনি কিন্তু জেনারের আগেই ১৭৮৯ সালে এই কাজ করেছিলেন। কাজেই জেনারই

প্রথম ব্যক্তি নন, যিনি কাউ পক্সের রস কাজে লাগিয়ে স্মল পক্স থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন। তবে জেস্টি আর এই বিষয় নিয়ে ভাবেননি বা অন্য কাউকে টিকাকরণ করেননি। নিজের পরিবার রক্ষা করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কাউকে পথ দেখাননি। তাই পরে হলেও পথ দেখানো পথিকৃত জেনারই।

ইতিহাস থেমে থাকে না। সে এগিয়ে চলে—এখনও চলছে। জেনারের পর আরেকজনের নাম না নিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি লুই পাস্তুর, যিনি টিকাকরণকে আকও কয়েক যোজন এগিয়ে দিয়েছেন।

লুই পাস্তুর জীবাণুতত্ত্ব ও টিকা

এডোয়ার্ড জেনারের জন্মের ৭৩ বছর পরে ১৮২২ সালে লুই পাস্তুর ফ্রান্সের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসলে ছিলেন একজন রসায়নবিদ। তিনি অঙ্কের ডিগ্রিধারী ছিলেন, পরে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে কিছুদিন কাজ করে strasbourg বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের মেয়েকে বিয়ে করে ৫ সন্তানের জনক হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের তিনজনই অল্প বয়সে টাইফয়েডে মারা যায়। পাস্তুর খুব দুঃখ পান এবং রোগের কারণ জানতে বেশি করে তৎপর হন।

চিত্র: ১৭. লুই পাস্তুর

পাস্তুরের এক ছাত্রের বাবার ছিল মদ তৈরির কারবার। তিনি দেখলেন, কিছু মদ টকে যাচ্ছে। এর কারণ বের করার জন্যে তিনি পাস্তুরকে অনুরোধ করেন।

এর আগে মানুষের ধারণা ছিল, কোনো কিছু খারাপ হয়ে গেঁজে যায় কোনো জীবাণুর কারণে এবং এই জীবাণুগুলো স্বতস্ফুর্তভাবেই তৈরি হয়। কোনো কিছু খারাপ হয়ে যাওয়া যে অন্য কোনো জীবাণুর কাজ, সে ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীতেই ছিল। কিন্তু তখন বলা হয় জীবাণুগুলো প্রকৃতিতে স্বতস্ফুর্ত ভাবেই তৈরি হয়।

পাস্তুর বললেন, জীবাণু তৈরি হয় জীবাণু থেকেই। বংশ বিস্তারের মাধ্যমে। আঙুরের থেকে যে মদ তৈরি হয়, তাও এই জীবাণুর কাজ—যে জীবাণুর উৎস আঙুরের খোসা, সেখানে জীবাণু থাকে। মদ তৈরি করা এক ধরনের জীবাণুর কাজ আর টকে যাওয়া অন্য ধরনের জীবাণুর কাজ। এটা প্রমাণ করতে পাস্তুর আঙুরের খোসার ভিতর থেকে সুচের মাধ্যমে রস নিয়ে রেখে দেখালেন, কোনো মদ তৈরি হয়নি।

তবুও স্বতস্ফুর্ত মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা, বিশেষত Rouen Museum of Natural History-এর ডিরেক্টর Felix Archimede Pouchet পাস্তুরের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সমস্যা মেটাতে French Academy of Sciences একটি পুরস্কারের ঘোষণা করল, দু-জনের মধ্যে যিনিই তার মতবাদ প্রমাণ করে জয়ী হবেন, তিনি Alhumbert পুরস্কার স্বরূপ ২৫০০ ফ্রাঁ পাবেন।

পাস্তুর এর আগে দেখেছিলেন ভালো করে ফোটালে জীবাণু মরে যায়। তাই তিনি একটি ফ্ল্যাস্ক জীবাণু তৈরির মিডিয়াম নিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে রেখে দেখালেন, কোনো জীবাণু জন্মালো না তারপর তা ভেঙে ফেলে রাখার পরে দেখালেন বাইরের ধুলোর সংস্পর্শে আসার পর তাতে জীবাণু জন্মাল। স্বভাবতই পাস্তুর জিতলেন ও পুরস্কার পেলেন।

এভাবে পাস্তুর বোঝালেন, কোনো কিছু গেঁজে যাওয়া, এমনকী মানুষের শরীরের ঘা পেকে যাওয়া—এসব জীবাণুর জন্যে হয়, আর একটি জীবাণু থেকে আরেকটি তৈরি হয়। এই পর্যবেক্ষণ তৎকালীন বিখ্যাত সার্জেন জোসেফ লিস্টারকে জীবাণুমুক্তভাবে সার্জারি করার পথ দেখিয়েছিল।

চিত্র : ১৮. পাস্তুর ও জোসেফ মিস্টার

পাস্তুর দেখালেন, গরম করে ফুটিয়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করলে জীবাণুগুলো মরে যায়—একে এখন বলে পাস্তুরাইজেসান, এভাবে এখনও দুধকে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

এতক্ষণ বোধহয় ধান ভানতে শিবের গীত হল। পাস্তুর নিয়ে অনেক কথা হল, কিন্তু টিকার কথা বলতে গিয়ে সে পর্যন্ত এখনও পৌঁছানো গেল না। এবার সেই গল্পে আসব। হ্যাঁ, এও আরেক গল্প।

পাস্তুর এই সময় চিকেন কলেরা বা মুরগির কলেরার উপর জীবাণুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি কলেরা জীবাণুকে চিকেনের শরীরে Inoculate করতেন।

একদিন তিনি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট চার্লস চেম্বারল্যান্ডের উপর এই দায়িত্ব দিয়ে ছুটিতে গেলেন। চেম্বারল্যান্ড চলে গেলেন—কাজ ফেলে। মাস খানেক পরে এসে চেম্বারল্যান্ড সেই পুরানো কালচারের জীবাণু দিয়ে মুরগিদের Inoculate করলেন। কিন্তু তিনি এবং পাস্তুর ফিরে এসে দেখলেন, কোনো মুরগিরই কলেরা হল না। চেম্বারল্যান্ড ত্রুটিমুক্ত কাজ বা জীবাণু ভেবে একে ফেলে দিতে গেলে হঠাৎ করে পাস্তুরের মাথায় এল, তবে কি মুরগিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাল? পরীক্ষা করে দেখা যাক? তিনি কিছুই ফেলতে দিলেন না। বরং কিছুদিন পরে টাটকা জীবাণুদের মুরগির শরীরের ঢোকালেন এবং তাঁর অনুমান সত্যি করে দেখা গেল কোনো মুরগিরও কলেরা হল না, অর্থাৎ তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ভুলের মাধ্যমে আর এক মহান আবিষ্কার হল। আবিষ্কার হল, যে রোগের জীবাণুকে কৃত্রিম ভাবে একটু অন্য রকম করে দিতে পারলেই তারা রোগ তৈরি করে না, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 'টিকা' তৈরির ইতিহাস এগিয়ে গেল কয়েক কদম।

জেনারের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছিল, এক ধরনের জীবাণু অন্য ধরনের জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত রোগ প্রতিরোধ করে, আর পাস্তুরের

আবিষ্কারের ফলে জানা গেল, একই জীবাণুকে কৃত্রিমভাবে মেরে বা দুর্বল করে দিয়ে Inoculate করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

পাস্তুরের সহকর্মী ডা. এমিল রক্স জলাতঙ্কে আক্রান্ত খরগোশের মস্তিষ্কে জীবাণু মেরে তা কুকুরের শরীরে প্রয়োগ করে টিকা আবিষ্কারের পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ৫০টি কুকুরকে টিকাকরণ করে সফলও হয়েছিলেন। এমন সময়ে ১৮৮৫ সালে জোসেফ মিস্টার (Joseph Meister) নামের ৯ বছর বয়সের এক বালককে জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুরে কামড়ায়। তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। পাস্তুর নিজে ডাক্তার না হয়েও, পরে মামলা মোকদ্দমার ভয়ে পিছিয়ে না গিয়ে মিস্টারকে টিকাকরণ করেন। মিস্টার বেঁচে যায়, আর ধন্য ধন্য পড়ে যায় পাস্তুরের নামে। পাস্তুরের এই পরীক্ষা জলাতঙ্কের হাত থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। শুরু হয় টিকার এক নতুন অধ্যায়।

চিত্র: ১৯. ডা. এমিল রক্স

ইতিহাসের গল্পে আর এগোবো না। প্রতিটি আবিষ্কারের ছত্রে ছত্রে এরকম অনেক গল্প লুকিয়ে আছে। তবু আজ যে মারণাস্ত্রের জোরে আমরা, মনুষ্য প্রজাতি বুক ফুলিয়ে অনেক শত্রুকেই বলতে পারছি—দূর হটো, সেই মারণাস্ত্রের এটুকু ইতিহাস জানা দরকার।

বিভিন্ন টিকা আবিষ্কারের সময় সারণি

এবার সংক্ষেপে টিকা আবিষ্কারের একটি সময় সারণী উল্লেখ করি:

সাল	আবিষ্কার
১১০০	Variolation শুরু হয় আফ্রিকা, চীন, তুরস্ক ইত্যাদি দেশে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুরু অবশ্য তার আগে থেকেই হয়েছিল, কবে কেউ জানে না।
১৭২১-২২	ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় variolation-এর প্রসার হয়।
১৭৮৯	বেঞ্জামিন জেস্টি তার পরিবারের সদস্যদের inoculate করেন।
১৭৯৬	এডওয়ার্ড জেনার ৮ বছরের বালক জেমস ফিপস-কে inoculate করেন। অন্য রোগের জীবাণুর সাহায্যে মানুষকে গুটি বসন্ত থেকে রক্ষা করার প্রথম সফল প্রয়াস এটি।
১৮৭৯	লুই পাস্তুর চিকেন কলেরার টিকা আবিষ্কার করেন।
১৮৮৫	লুই পাস্তুর ও এমিল রক্স জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করেন।
১৮৯০	প্রথম টিটেনাসের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৮৯৬	টাইফয়েড ও মানুষের কলেরার টিকা আবিষ্কার হয়।
১৮৯৭	বিউবোনিক প্লেগের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯১৪	টিটেনাস টক্সয়েড আবিষ্কার হয়।
১৯২১	ডিপথিরিয়ার টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯২৭	প্রথম বি.সি.জি. টিকা শিশুর উপর প্রয়োগ করা হয়।
১৯২৭	হুপিং কাশির টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৩২	ইয়োলো ফিভারের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৩৭	টাইফাস রোগের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৪৫	ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৫২	পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন Dr. Jonas Salk
১৯৬২	ওরাল পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন Dr. Albert Sabin
১৯৬৩	হামের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৬৭	মাম্পসের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৭০	রুবেলার টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৭৪	নিউমোনিয়ার টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৭৮	মেনিঞ্জাইটিসের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৮১	হেপাটাইটিস-বি-র টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৮৫	হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৯২	জাপানি এনকেফালাইটিস রোগের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৯২	হেপাটাইটিস-এ-র টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৯৫	চিকেন পক্সের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৯৮	লাইমস ডিজিজের টিকা আবিষ্কার হয়।
১৯৯৮	রোটা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার হয়।
২০০৬	হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার হয়।
২০১৩	এনট্রোভাইরাস-৭১, যা Hand foot mouth রোগের কারণ, সেই টিকা আবিষ্কার হয়।

উপরের সারণির সঙ্গে কারও কারও মতভেদ থাকতে পারে। টিকা আবিষ্কার যখন হয়, সেই সময়েই মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয় না। অনেক পরীক্ষার পরে অন্য সময়ে প্রয়োগ শুরু হয়।

এরপরে বিজ্ঞান এগিয়েছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে। আরও পরে আমরা জেনেছি, টিকা কীভাবে শরীরের প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জেনেছি অসংখ্য প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি জীবাণুর কথা। পেয়েছি তাদের পরিচয়, উদ্ধার করেছি তাদের নাম গোত্র ঠিকুজি কোষ্ঠী। সে সব আলোচনা পরে হবে।

বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মানুষ আক্রান্তকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে মারণ-বাণ তৈরি করতে। কোথাও সাফল্য এসেছে, কোথাও আসেনি। নতুন নতুন জীবাণুও তৈরি হচ্ছে, আক্রমণ করছে মানুষকে। যেমন বর্তমান এইডস একটি মারণ রোগ—যার বিরুদ্ধে এখনও প্রতিরোধ বা টিকা তৈরি করা যায়নি। তবে একদিন অবশ্যই মানুষ সফল হবে। যেমন সফল হয়েছে গুটি বসন্তের ক্ষেত্রে। এ সেই মনুষ্য প্রজাতির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড জেনারের অদম্য জেদ—যা তাকে সাফল্য দিয়েছে।

আজ পৃথিবী থেকে গুটি বসন্ত নির্মূল হয়েছে। ১৯৭৭ সালে পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় করা গিয়েছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা

করেছে : ''The world and all its people have won freedom from smallpox, which was the most devastating disease sweeping epidemic form through many countries since earliest times, leaving in death, blindness and disfigurement in its wake.''

মানে গুটি বসন্ত থেকে আজ পৃথিবী মুক্ত, যে এক সময় মানুষকে প্ররোচিত করেছিল টিকা আবিষ্কার করতে। এ যেন সেই নবজাতকের কাছে বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করার প্রতিজ্ঞা। তাই মানুষ তার সাধনায় এগিয়ে চলেছে, একে একে তৈরি করছে ক্ষতিকারী জীবাণু ধ্বংসের অস্ত্র-টিকা। আর তাই সে আজ পৃথিবীর উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, তাই সে অমৃতের পুত্র।

| ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। |

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন

প্রাপ্তিস্থান: শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র চেঙ্গাইল, বেলতলা, হাওড়া

কুচিকিৎসার কথা

চিকিৎসককে ভুলে যেতে হয় তাঁর দীর্ঘ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, সরিয়ে রাখতে হয় তাঁর 'ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট' মেধা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ও রোগীর প্রতি সহমর্মিতা। কেননা রোগীর উৎকণ্ঠাই তো অনৈতিক চিকিৎসা-ব্যাবসার মূল পাথেয়—লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

শরীরই সবসময় কারোর ঠিকঠাক চলে না, চিকিৎসার দরকার হয় আমাদের সবারই। চিকিৎসা করাতে গিয়ে চিকিৎসা বিভ্রাটের শিকার হতে হয় না এমন দিন প্রায় লোপ পেতে চলেছে। সাধারণ সর্দিকাশি, জ্বরজ্বালার ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিভ্রাট তবু কম। আপৎকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা মধ্যবিত্ত মনে এক বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা, 'ভরসা' একমাত্র নামিদামি বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতাল। সেখানে কোনো অজ্ঞাত কারণে রোগীর কক্ষে রোগীর আত্মীয়পরিজনদের প্রবেশ নিষেধ। ডাক্তারবাবু রোগীর রোগের টিকিটির নাগাল পেলেন কি না, রোগী সুস্থ হবেন কি না, চিকিৎসার খরচের বোঝা কত ভারী হবে কিছুই বোঝা যায় না যতক্ষণ না রোগী রোগমুক্ত হয়ে বাড়ি যাচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এমন সরকারি হাসপাতাল আছে, যেখানে রোগীর বিছানার কাছে তার আত্মীয়পরিজনদের অবাধ আনাগোনা বাঞ্ছিত। কে না জানে, রোগীর সেবাশুশ্রূষা বা ফাইফরমাস খাটার কাজগুলো রোগীর আত্মীয়পরিজনদের চেয়ে নিঃস্বার্থভাবে আর কেউ করতে পারেন না। এ তো হল আমাদের 'সেরা' হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার অস্বচ্ছতার কথা।

চিকিৎসা পরিষেবায় এক পরিবর্তন আজ সবার কাছেই বেশ স্পষ্ট। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেও চিকিৎসকের অসাধুতা প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়নি। সেই অসাধু ব্যাবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক যন্ত্রনির্ভর চিকিৎসা পরিষেবার অবনমন। সুশিক্ষিত চিকিৎসকের মেধা, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিদায় হয়েছে। বর্তমান চিকিৎসা ব্যাবসা সুচতুরভাবে পশ্চিমী ধারার ফ্লো-চার্ট মেনে গাদা গাদা দামি পরীক্ষা করে রোগের চিকিৎসার প্রহসন চালাতে থাকে আর চিকিৎসা-ক্ষেত্রে জাতীয় ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক সওদাগরদের পুষ্ট করতে থাকে। বলাই বাহুল্য, ফ্লো-চার্ট চোখ বুজে মেনে চিকিৎসায় মেধার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃতভাবে কম। এই কুচিকিৎসার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক।

চিকিৎসায় মেধার অবনতি

বিশ্লেষণ নির্ভর অনুমান (ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট) বলে একটা গুণের কথা চিকিৎসক-সমাজে সমাদৃত। রোগলক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে এক জন চিকিৎসককে প্রথমে গুটিকয় সম্ভাব্য রোগ অনুমান করতে হয়। এর উপরে ভিত্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দিয়ে, তার পাশাপাশি সুচিন্তিতভাবে নির্বাচিত কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা সঠিক রোগের অস্তিত্ব নির্ণয় ও তার তীব্রতা নিরূপণ করে ফেলতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় চিকিৎসকের বিশ্লেষণক্ষমতার পরীক্ষা হয়, ফলে তিনি তাঁর শেখা বিদ্যার প্রয়োগের শ্লাঘাপূরণের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারে, আর রোগীর প্রতিও সুবিচার করা হয়। কর্পোরেট সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এখন এই 'ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট' অবহেলিত, অমর্যাদার শিকার।

কী এই ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট? মনে করুন এক জন রোগী জ্বরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে গেলেন। বিচক্ষণ ডাক্তার প্রথম পর্যায়ে রোগীর রোগলক্ষণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন, রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করবেন। যদি দেখা যায় জ্বরের সঙ্গে রোগীর কাশিও আছে আর রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে অস্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে, ডাক্তার চিকিৎসায় যুক্তিসঙ্গত অনুমানের প্রয়োগ করে ফুসফুসের সংক্রমণের রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেবেন। রোগনিরূপণে সংশয় থাকলে বা রোগের মাত্রা তীব্র হলে প্রাথমিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের শ্বেতকণিকা ও বুকের এক্স-রে পরীক্ষা করতে দেবেন। কিন্তু প্রথমেই টাইফয়েড রোগ নির্ণয়ের জন্য 'ভিডাল (widal)" পরীক্ষা, প্রস্রাবের নির্গমনের পথের সংক্রমণের রোগ (urinary tract infection) নির্ণয়ের জন্য 'প্রস্রাব পরীক্ষা" অথবা পিত্তথলিতে সংক্রমণের (cholecyctitis) রোগের জন্য পেটের আলট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষা করতে হুকুম জারি করবেন না।

সাম্প্রতিককালে দু-টি কারণে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রথমত পশ্চিমী ধারা অনুকরণে চিকিৎসা যুক্তিসঙ্গত অনুমানের উপর নির্ভর কমিয়ে সম্ভাব্য সবরকমের রোগের পরীক্ষার প্রবণতা বাড়ছে। দ্বিতীয় কারণটি চিকিৎসক আর রোগীর বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের ভাঙন। ফলে সচেতন ও অবচেতনভাবে চিকিৎসক নিজের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে চিকিৎসায় যা যা অবহেলা বলে পরে মনে করা হতে পারে সেগুলোর সবগুলোই বন্ধ করার প্রচেষ্টা করছেন তাই অপ্রয়োজনীয় হলেও হরেকরকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেবার তাগিদ তৈরি হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা এড়াতে শক্তিশালী 'ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট' চিকিৎসককে পুরস্কৃত করে না। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার জন্য দুর্বল 'ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট' চিকিৎসককে সাজা দেয় না। পশ্চিমী দেশগুলিতে এই প্রবণতায় রাশ টানার জন্য বিভিন্ন রোগের বিধিসম্মত নির্দেশিকা আছে। আমাদের দেশেও কিছু আছে, কিন্তু নেই সেই নির্দেশিকার সফল প্রচার ও প্রয়োগ। এই নির্দেশিকাগুলির দুর্বলতা এই যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রত্যেক রোগীরই কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে আর নির্দেশিকাগুলি কখনোই একশো শতাংশ

ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে প্রয়োগ করা যায় না। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সেই রোগীর জন্য আলাদা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যে সিদ্ধান্ত চিকিৎসক বা রোগী ভেদে আলাদা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

চিকিৎসায় অসাধুতা (Dishonesty)

চিকিৎসাবিজ্ঞান আগে কম উন্নত ছিল, কিন্তু ডাক্তাররা অসৎ ছিলেন না। ডাক্তাররা তাঁদের স্বল্প বিদ্যে নিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করতেন। অসফল হলে, রোগী চিকিৎসাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দোষ দিতেন, ডাক্তারের বিদ্যে, প্রচেষ্টা বা সততায় সন্দেহ করতেন না। এখন চিকিৎসা-প্রযুক্তি রকেটের বেগে ধাবমান। বছর বছর নিত্যনতুন ওষুধ আর চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কঠিন কঠিন ভয়াবহ সব রোগের চিকিৎসা নিয়ে ঝকঝকে সুসজ্জিত হাসপাতালগুলো অধীর আগ্রহে মিলিটারি পোজে অপেক্ষা করছে, শহরের বিলবোর্ডে তার প্রচারে কোনো খামতি নেই। যাঁরা হাসপাতাল তৈরিতে অর্থ লগ্নি করেছেন, তাঁরা দ্রুত লাভের মুখ দেখতে চান। তাই ওনাদের খপ্পরে পড়লে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। কোনোক্রমে রোগের সুরাহা হয়তো হচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারকে মাঝেমধ্যেই বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। বিচারক তাঁর অচেনা জগতের বিষয়ে অন্তিম রায় দিয়ে দিচ্ছেন—''ডাক্তার সৎ, না অসৎ''। এই প্রশ্নের শেষ উত্তর সঠিক না ততটা ঠিক নয়, এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এটা মনে করলে ভুল হবে না, চিকিৎসা পরিষেবা এখন আর আগের মতো চোখ বুজে গ্রহণযোগ্য নয়, নিক্তিতে মেপে বিচারযোগ্য। আসলে চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণের সঙ্গে আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে চিকিৎসা পরিষেবার সততা, স্বচ্ছতা আর মানবিক বিচারে নির্ভরযোগ্যতা নামক বৈশিষ্ট্যগুলোকে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিসর্বস্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানের আকাশছোঁয়া মূল্যের নাগাল পেতে সাধারণ মানুষকে সাধ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্পোরেট দুনিয়া স্বাস্থ্যের এক অবাস্তব ছবি নাকের ডগায় খুড়োর কলের মতো ঝুলিয়ে দৌড় করাচ্ছে। সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় সেই কল্পিত সুস্থতার (!) স্পর্শ পাওয়া সম্ভবও নয়। যেটা আমরা ভুলে যাই, কর্পোরেট-অঙ্কিত স্বাস্থ্য চিত্রটি আমাদের অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সেটার অপ্রয়োজনীয়তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক হল, আর্থিক ক্ষমতার শেষ সীমায় গিয়ে প্রাপ্তির ঝোলায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না পেয়ে বিদ্রোহ, ডাক্তারের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে শারীরিক নিগ্রহ, মামলা-মোকদ্দমা, ক্রেতা সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারে খটাখটি ইত্যাদি। মান-অভিমানের পালা কখনো কি একতরফা চলে? ডাক্তারও কোনো এক পরিবারের সদস্য; কারও বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী বা স্ত্রী। তাই তাঁকেও একটা অবস্থান নিতে হয়। কেবল আত্মরক্ষার জন্য ডাক্তারের রোগী-সম্পর্কিত মানসিকতা যখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, সমাজ কি তার জন্য তৈরি থাকে? কে আগে আক্রমণ করেছে এই প্রশ্ন এখন অবান্তর। চিকিৎসার পরিবেশের পরিবর্তন দরকার। জোর খাটিয়ে বা মূল্যের বিনিময়ে অনেক জাগতিক কিছু পাওয়া গেলেও আন্তরিকতা ক্রয়যোগ্য বিষয় নয়।

ধরা যাক, বুকের ব্যথায় কাতর একজন মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারস্থ হলেন। পরিসংখ্যান বলছে, এমন রোগীর খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে প্রাণসংশয়কারী হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা থাকে (প্রায় ১.৫ শতাংশ)[১]। ডাক্তার অতি রক্ষণাত্মক হলেও বাণিজ্যিক না হলে বহুলাংশে হৃদ্‌রোগের পরীক্ষানিরীক্ষার ঝক্কি ও খরচ এড়ানো সম্ভব। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা (ও এই প্রতিবেদকেরও উপলব্ধি), এসব ক্ষেত্রে প্রাইভেট হাসপাতালে অনেক সময় ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয় ও আতঙ্কগ্রস্ত রোগী কল্পিত রোগের পরীক্ষানিরীক্ষা ও ভুল চিকিৎসার শিকার হন। রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে বুকের ব্যথায় কাতর রোগীকেও চিকিৎকসা-ব্যবসায়ী মূল্যায়ন করেন, কতদূর অবধি দোহন করা যাবে। অপ্রয়োজনে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয়। হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ ছাড়া এটা অনেক চিকিৎসকেরও জানা নেই যে, হার্টের রক্তনালীতে ব্লক থাকলেই সেটাকে রোগের উপস্থিতি হিসাবে ধরে নেওয়া যাবে না, বা তার জন্য অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করতে হবে না। সে আলোচনা অন্য পরিসরের জন্য মুলতুবি থাক। সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়, তবুও সীমিত পরিসংখ্যানে পাওয়া তথ্যে, ৫৫ শতাংশ হৃদ্‌রোগের অস্ত্রোপচার অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।[২] এবং এই অপ্রয়োজনীয় কাঁটাছেঁড়ার অধিকাংশই অসৎ চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে, অজ্ঞানতার কারণে নয়।

অস্বচ্ছ চিকিৎসা পরিষেবা

যদি আপনার গাড়ি বিগড়ে যায়, গ্যারেজের মেকানিক আপনাকে বোঝান, গাড়ির কোন যন্ত্রাংশ কাজ করছে না। তারপর সারানোর আনুমানিক খরচের

বহর জানিয়ে, আপনার অনুমতি নিয়ে তার মেরামত করেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করছে না সেটা অনেক সময়েই বুঝতে দেরি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালাবার পাশাপাশি সম্ভাব্য আনুমানিক রোগসমষ্টির সাধারণ চিকিৎসা শুরু করে দিতে হয়। চিকিৎসার এই পর্বের সীমাবদ্ধতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। এতে ব্যক্তি চিকিৎসকের বা চিকিৎসাসংস্থার কোনো হীনমন্যতার কারণ নেই, বা সম্ভাব্য আইনি জটিলতার সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে প্রায় সর্বদাই রোগী ও তার আত্মীয়পরিজনদের একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়। অসুস্থ শরীরের চিকিৎসা চলতে থাকে, কিন্তু ডাক্তার যদি অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝিয়ে না বলেন তবে রোগী ও তার আত্মীয়পরিজনদের মানসিক উৎকণ্ঠা সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যায়। এটা তো একরকম অন্যায় অত্যাচার। রোগীর সঙ্গে চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও তার যথাযথ কৌশল চিকিৎসাবিদ্যার পাঠক্রমে শেখানো হয় না। গুটিকয় সহৃদয় চিকিৎসক নিজের প্রচেষ্টায় সেটা নিজের মতো করে রপ্ত করে নেন। অন্য সব ক্ষেত্রে রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকলে রোগীর আত্মীয়পরিজনদের দু-বেলা নিয়মামাফিক হাজিরা দেওয়া, চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার তদবির করা, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আনা ইত্যাদি কাজ করা ও ক্যাশ কাউন্টারে বিল মেটানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ থাকে না।

এই সব দেখে রোগী ও তার আত্মীয়পরিজনরা যদি ভাবেন যে চিকিৎসান্তে অন্তত রোগের কারণ জানা যাবে, তো বলব তাঁরা খুব বেশি

আশা করে ফেলেছেন। হাসপাতালের বহির্বিভাগ আর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের চেম্বারে পাওয়া ওষুধপত্রের নিদানপত্রে (প্রেসক্রিপশনে) যে ওষুধের উল্লেখ করা থাকে সেগুলো কোন রোগের জন্য সেটা প্রায় কেউই উল্লেখ করেন না বা করলেও এমন সাংকেতিক অপাঠ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেন যে সতীর্থ চিকিৎসকগণও বুঝতে পারেন না। হাসপাতাল থেকে কোনোক্রমে সুস্থ হয়ে রোগী বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসাবে ''ডিসচার্জ সামারি'' থেকে রোগী নিজে বা অন্য চিকিৎসকের সাহায্যে ব্যাপারটা অনেকটা জানতে-বুঝতে পারেন। কিন্তু ইনসিওরেন্স থাকলে মুশকিল—এই নথি কোনো প্রতিলিপি ছাড়াই ইনসিওরেন্সের দপ্তরে জমা পড়ে যায়। ডিসচার্জ সামারি হল একমাত্র নথি, যেখানে চিকিৎসক রোগের ও চিকিৎসার বিবরণ লিখতে বাধ্য হন। সেটা পাওয়া গেলেও অনেক সময় অস্পষ্ট, অপাঠ্য ও অনুমোদনহীন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো চিকিৎসকও পরবর্তীকালে তার মর্মোদ্ধারে অক্ষম হতে পারেন। এই অস্পষ্টতাকে পাথেয় করে চলতে থাকে দায়বদ্ধহীন একমুখী চিকিৎসা-ব্যাবসা। রোগীকে বাধ্য করা হয়, পরবর্তীকালে চিকিৎসার জন্য ওই চিকিৎসক বা চিকিৎসা-সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়।

পরিবর্তনশীল চিকিৎসা-প্রযুক্তির সঙ্গে চিকিৎসকের তাল মিলিয়ে চলার ভ্রান্ত উপায় (Faulty continuing medical education)

নিত্যনতুন রোগের উদয় হচ্ছে, পুরোনো রোগ জটিল হচ্ছে, নতুন ওষুধ নতুন চিকিৎসা-প্রযুক্তি পুরোনো চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বাতিল করে দিচ্ছে। ব্যস্ত ডাক্তারবাবু সে সব খবর জানবেন কীভাবে? যত নামিদামি ডাক্তার, তত বেশি তাঁর পসার আর কর্মব্যস্ততা, তত কম তাঁর বই পড়ার সময়। পশ্চিমী দেশগুলিতে ডাক্তারদের লাইসেন্স নবীকরণের জন্য নিয়মিতভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হয়। সেখানেও দুর্নীতি আছে! কেবলমাত্র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার শংসাপত্র জোগান দেওয়ার প্রয়োজনে গজিয়ে উঠছে নিত্যনতুন সম্মেলন আয়োজককারী ব্যাবসায়িক সংস্থা। আমাদের দেশেও এমনতর ধারা শুরু হওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশে অধিকাংশ পাশ-করা ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের ভার ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত! এই প্রতিনিধিদের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি মূলত ওষুধ বিক্রয় বাড়ানোর জন্য নিয়োগ করে থাকে। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সেলসম্যানরা নিরপেক্ষ তথ্য জোগান দিতে পারেন না। তার চেয়ে বড়ো কথা, একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক তার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে উচ্চশিক্ষিত কোনো চিকিৎসকের উপরই নির্ভর করতে পারেন।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্ভ্রান্ত চিকিৎসা সম্মেলনগুলো এখন বড়ো বাজেটের কর্মকাণ্ড, ওষুধ কোম্পানির প্রয়োজনে ও দাক্ষিণ্যে পালিত। সেখানে নিরপেক্ষ জনহিতকর বিজ্ঞানের চর্চা অবহেলিত। এটা ভেবে হতাশ হতে হয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার আজ প্রধানত ওষুধ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থার দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। সমকালের রোগের চিকিৎসার জন্য উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত চিকিৎসকের দু-টো গুণের অধিকারী হতে হয়—যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ইচ্ছা আর মহাসমুদ্রের সমতুল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্যভাণ্ডার থেকে নিজের পেশার প্রয়োজনের তথ্য আহরণ করার কৌশল রপ্ত করা।

রোগী ও চিকিৎসক অধিকাংশ সময়েই অবচেতনভাবে প্রচলিত প্রথার শামিল হয়ে যথাক্রমে কুচিকিৎসার শিকার হন ও কুচিকিৎসা করার দায়ে দায়ী হন। সব ক্ষেত্রেই ক্ষতিটা মারাত্মক অথবা দৃশ্যমান নয়। আন্ত্রিক রোগে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই জেনেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতিটা প্রধানত আর্থিক মনে হলেও মনে রাখতে হবে অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও তার রোগনির্মূল ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাওয়াটাও ক্ষতিকারক। গুটিকয়েক অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া মানব শিশুর জন্ম একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। শিশুর জন্মের সাহায্যকারী হিসাবে চিকিৎসকের ভূমিকা পালনের কথা, শিশুজন্ম ব্যাপারটা নিজের রুটিনমাফিক সময়মতো 'করিয়ে দেওয়া'-র কথা নয়, অথচ অধিকাংশ সিজারিয়ান সেকশনে তা-ই হয়। ডাক্তারের সুবিধাজনক সময়ে অপারেশন টেবিলে কাজটি সেরে ফেলাও হয়। এতে চিকিৎসকের সময় বাঁচে, অর্থসমাগম হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও খুশি হয়। দুঃখের কথা, রোগীও ভাবেন এতে তাঁর সুবিধা হয়। কিন্তু এটা একটা সুচতুরভাবে তৈরি করা কৃত্রিম প্রয়োজন। সিজারিয়ান সেকশনের অসুবিধাগুলো যে ভাবী মায়ের অজানা। স্বাভাবিক জন্মের সুবিধাগুলো ভাবী মায়েদের বোঝানো চিকিৎসকের দায়িত্ব। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে মায়ের গর্ভে অবস্থিত, জন্মের অপেক্ষায় হবু নবজাতকদের, আগামী দিনের নাগরিকদের জন্মলগ্ন থেকেই অন্যায়ের শিকার হতে হয়। বুকে ব্যথা হলে সেটা কালেভদ্রে হৃদ্‌রোগের জন্য হতে পারে। যদি সেটা হৃদ্‌রোগের জন্যও হয়, সেই রকম হৃদ্‌রোগের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের অ্যানজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপনের দরকার হয়। চিকিৎসককে ভুলে যেতে হয় দীর্ঘ প্রশিক্ষণের জ্ঞান, শিকেয় তুলে রাখতে হয় তার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট, মেধা আর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা। রোগীর উৎকণ্ঠাকে পাথেয় করে চলতে থাকে অনৈতিক চিকিৎসা-ব্যাবসা। এই কুমির চুরির সম্পদের এক ভগ্নাংশ প্রাপ্তিতে চিকিৎসক উল্লসিত হন, যদিও এর মুখ্যভাগে পুষ্ট হতে থাকে কর্পোরেট হাসপাতাল ও বহুজাতিক ওষুধ ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো। কুচিকিৎসা চিকিৎসকের মোটেই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কুফল নয়, বরং সেটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভ্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রণালী, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণের ফসল। আর কুচিকিৎসা থেকে সুচিকিৎসার বলয়ে ফিরতে গেলে তাই আমাদের 'বড়ো' ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন 'ভালো' ডাক্তারের।

আর প্রয়োজন মুনাফাকেন্দ্রিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে মানব-কেন্দ্রিক চিকিৎসাব্যবস্থা।

সূত্র:

১। Klinkman MS, J Fam Pract 1994: 38(4):345, Episode of care for chest pain: a preliminary report from MIRNET, Michigan Research Network.

২। http://timesofindia.indiatimes.com/india/44-advised-unnecessary-sugery-2nd-opinion-givers/articleshow/45746903.cms

| ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। |

কৃমি

স্বাস্থ্যের পত্রিকায় শেষ অবধি কিনা কৃমি! আরে আজকের দিনে কৃমি কি একটা বলার মতো অসুখ? ওষুধ খেলেই সেরে যায়, আর একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তো রোগটা হয়ই না। এ নিয়ে একটা গোটা নিবন্ধ লেখার আছেটা কী? আছে, কৃমি নিয়েই অনেক কিছু জানার দরকার আছে— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

কৃমি আর তেমন কি রোগ, তাই বলছিলেন না? ঠিক আছে একটা তুলনা করা যাক। পাঠকরা যে সব ব্যাপার নিয়ে নানা কারণে মাথা ঘামাতে বাধ্য হন, সেটার একটা হল হেলথ ড্রিঙ্ক। এবার ধরুন, আমাদের দেশে থেকে যদি কোনোভাবে সব হেলথ ড্রিঙ্ক, হরলিক্স-কমপ্ল্যান এই সবের কথাই বলছি, এগুলো যদি আইন করে তুলে দেওয়া যায়, তা হলে বাচ্চাদের শরীর-স্বাস্থ্যের যত ক্ষতি হবে, তাই চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি করে কৃমি। ও হ্যাঁ, হেলথ ড্রিঙ্ক খেয়ে বাচ্চাদের লাভ বেশি হয় না কি ক্ষতি, সেটার মীমাংসা আমরা এখানে করব না। খালি বলব, বাচ্চার শরীরের প্রতি যদি যত্ন নিতেই হয়, তার উপায় টিভি বা কাগজের রঙিন বিজ্ঞাপনে খুঁজলে ঠকবেন। খুঁজতে হবে শরীরের যত্ন নেওয়ার খুব সাধারণ কথাগুলোতে। আর কৃমির চিকিৎসা হল সে সাধারণ কথাগুলোর একেবারে গোড়ার কথা।

আচ্ছা, আপনি ছোটোবেলা থেকেই নিশ্চয়ই শুনেছেন, বেশি মিষ্টি খেলে পেটে কৃমি হয়? এও শুনেছেন কৃমি হলে বাচ্চা রাতে দাঁত কিড়মিড় করে? কিংবা বাচ্চার পিছন না চুলকালে তার কৃমি হয়নি? এও জানেন বোধহয়, কৃমির ওষুধ খেয়ে পেট থেকে কৃমি বেরিয়ে গেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়? আর কৃমি প্রায় সব বাচ্চারই থাকে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই, ভয় পাওয়ার মানেই নেই, বাচ্চা দিব্যি থাকে? জানেন নিশ্চয়ই এই সব কথা?

এবার জেনে রাখুন, ওপরের সব কথাগুলো ভুল। সত্যি কথা হল, মিষ্টি খাবার সঙ্গে পেটে কৃমি হওয়ার সম্পর্ক নেই। কৃমির ওষুধ দিয়ে পেট থেকে কৃমি বের করে দিলে বাচ্চার (বা বড়োদেরও) শরীর বিন্দুমাত্র দুর্বল হয়ে যায় না। রাতে দাঁত কিড়মিড় করার সঙ্গে কৃমির কোনো সম্বন্ধ নেই।

নানা জাতের কৃমি, নানা ব্যধি

আমরা আপাতত সহজপ্রাপ্য কৃমিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এই সব কৃমি মানুষের পেটে খাদ্য চলাচলের নালীতে, অর্থাৎ অন্ত্রে থাকে। এরা পরজীবী, আমাদের খাবার বা আমাদের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের মধ্যে প্রধান হল— কেঁচো কৃমি বা গোল কৃমি (round worm), বক্র কৃমি বা অঙ্কুশ কৃমি (hook worm), সুতো কৃমি (thread worm), চাবুক কৃমি (whip worm), ফিতে কৃমি (tape worm)। ফিতে কৃমির গল্পটা অবশ্য অন্য সব রকমের চাইতে অনেকটা আলাদা।

কেঁচো কৃমি বা গোল কৃমি (round worm)

মানুষের মলের সঙ্গে এই কৃমির অজস্র ডিম বেরিয়ে আসে, আর তার পর ডিমের ভেতর বাচ্চা কৃমি তৈরি হয়। অপরিষ্কার পানীয় জল বা কাঁচা শাকসব্জি ও অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ডিম খাদ্যনালীতে ঢোকে। মানুষের শরীরে ঢোকার পর ক্ষুদ্রান্ত্রে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে বাচ্চা কৃমি। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সেই বাচ্চা কৃমি প্রবেশ করে রক্তে, রক্তের স্রোত বেয়ে সে পৌঁছোয় ফুসফুসে। তার পর ফুসফুসের শ্বাসনালী ধরে ওপরে উঠে এরা আবার ঢোকে খাদ্যনালীতে। বড়ো হওয়ার পর গোল কৃমি ৬-১৫ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। অন্ত্রে বেশি কৃমি থাকলে পেটে ব্যথা, বদহজম হতে পারে। কখনো কখনো কৃমি গোলা বেধে খাদ্যনালীর ভেতরটা বন্ধ করে দেয়, সেটা একটা এমার্জেন্সি ব্যাপার; অপারেশনেরও দরকার হতে পারে। কেঁচো কৃমির বাচ্চা ফুসফুসে থাকার সময় কাশি, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। বড়ো কেঁচো কৃমি কখনো কখনো বমির সঙ্গে বেরিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বক্র কৃমি বা অঙ্কুশ কৃমি (hook worm):

ছোট্ট, লম্বায় মোটামুটি আধ ইঞ্চি, লাল রং। মানুষের পায়খানার সঙ্গে এই কৃমির ডিম বেরিয়ে আসে, আর মাটিতে মেশে। মাটিতে ডিম থেকে বাচ্চা কৃমি ফোটে। যাঁরা খালি পায়ে হাঁটা-চলা করেন, মাটি বা ঘাসে লেগে থাকা বাচ্চা কৃমি তাঁদের পায়ের চামড়া ফুটো করে শরীরে ঢুকে রক্তস্রোত বেয়ে পৌঁছোয় ফুসফুসে। তখন কাশি হয়, আর কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে গলায় উঠে আসে এই কৃমি, আর সেখান থেকে ঢুকে পড়ে খাদ্যনালীতে। তার পর এ কৃমি ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়ালে কামড়ে ধরে রক্ত চুষতে থাকে। পেটে পৌঁছোনোর পর পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা হতে পারে। তবে এই কৃমি থেকে হওয়া সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল রক্তাল্পতা।

সুতো কৃমি (thread worm) : সরু সুতোর মতো গড়নের সাদাটে এই কৃমি লম্বায় আধ ইঞ্চি। এরা থাকে মানুষের বৃহদন্ত্রে। রাতে স্ত্রী কৃমি ডিম পাড়ার জন্য মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন মলদ্বারে চুলকানি হয়, চুলকালে নখের ফাঁকে ডিমগুলো আসে, ভালো করে হাত না ধুয়ে খেলে ডিমগুলো পেটে ঢোকে। এ কৃমি ততটা ক্ষতিকর নয়, তবে মলদ্বারে চুলকায় বলে ''কৃমি মানেই পেছন চুলকানো'' এবং ''পেছন চুলকানো মানেই কৃমি'' — প্রায় সবারই এই দু-দুটো ভুল ধারণা আছে।

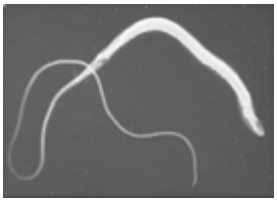

চাবুক কৃমি (whip worm) : লম্বায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি এই গোলাপি বা ধূসর কৃমির ডিম মানুষের মলের সঙ্গে বেরিয়ে খাবার-পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। চাবুক কৃমিও বক্র কৃমির (hook worm)

মতো অন্ত্রের দেওয়াল থেকে রক্ত চোষে, তবে পরিমাণে কম। এই কৃমি থেকে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা হতে পারে।

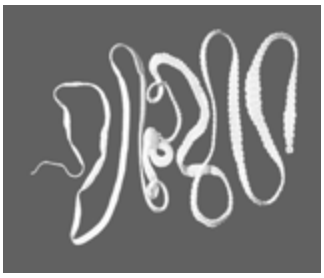

ফিতে কৃমি (type worm) : লম্বায় ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত হতে পারে এরা। ছোট্ট একটা মাথা, আর তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড চ্যাপটা ফিতের মতো অংশ— এই নিয়ে ফিতে কৃমির দেহ। মাথায় থাকা দাঁত দিয়ে কৃমি অন্ত্রের দেওয়াল কামড়ে থাকে। ফিতে কৃমির ডিম ও দেহাংশ টুকরো হয়ে মানুষের মলের সঙ্গে বেরোয়, আর খাবারের সঙ্গে সেই ডিম খেয়ে গোরু-মোষ বা শূয়োর আক্রান্ত হয়। তাদের খাদ্যনালী ভেদ করে বাচ্চা কৃমি মাংসপেশিতে সিস্ট বা থলি হয়ে বেঁচে থাকে। সংক্রমিত জন্তুর আধ-সেদ্ধ মাংস খেয়ে মানুষ সংক্রমিত হয়। পেটে ফিতে কৃমি থাকলে পেটে ব্যথা ও অপুষ্টি হতে পারে। শরীরের কোথাও সিস্ট তৈরি হয়ে নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে সিস্ট হলে বিপদ। যেমন মস্তিষ্কে সিস্ট হলে মাথাব্যথা, খিঁচুনি, এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

কৃমি-সংক্রমণ আটকাবেন কী করে?

হাত ধোওয়া, জুতো পরা, পরিষ্কার জল খাওয়া, সবজি ভালো করে ধুয়ে খাওয়া, খাবার বিশেষ করে মাংস ও শাকসবজি, যথেষ্ট ভালোভাবে ফুটিয়ে রান্না করা— এই হল কৃমিকে আটকানোর রাস্তা। বিশদে বলি—

- মলত্যাগের পর, খাওয়ার আগে, রান্না করা ও পরিবেশন করার আগে ভালো করে হাত ধুতে হবে। সাবান দিয়ে ধোবেন।
- খালি পায়ে বাইরে হাঁটবেন না। বক্র কৃমির বাচ্চা পায়ের চামড়া ফুটো করে শরীরে ঢোকে।
- কাঁচা ফল বা শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে খান। শাকসবজি ভালোভাবে সেদ্ধ করুন। গোল কৃমি ও চাবুক কৃমির থেকে বাঁচুন।
- গোরু বা শুয়োরের মাংস ফুটন্ত জলে অন্তত আধ ঘণ্টা সেদ্ধ করার পর রান্না করুন। ফিতে কৃমির হাত থেকে বেঁচে যাবেন।
- এছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। নিয়মিত স্নান করুন, নখ কাটুন, জামা-কাপড় পরিষ্কার করুন।

বুঝতেই পারছেন, এত সব কিছুর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পর্যাপ্ত পরিমাণে শুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান, আর পায়খানার সুবন্দোবস্ত। আমাদের দেশের গ্রামে বা শহরে গরিবদের দুটোরই অভাব।

কৃমির চিকিৎসা

কৃমির চিকিৎসার জন্য অনেক ভালো ভালো ওষুধ আছে। একটার কথা বলি, খুব কার্যকর ও নিরাপদ—মেবেন্ডাজোল (mebendazole)। গর্ভাবস্থায় বা দু-বছরের কম বয়সের শিশুদের ছাড়া সবাইকেই এ ওষুধ দেওয়া যায়। বয়স বা ওজন যাই হোক না কেন, ১০০ মিলিগ্রামের বড়ি ১টা করে দিনে দু-বার, তিনদিন খেতে হয়। ফিতে কৃমিতে অবশ্য দ্বিগুণ মাত্রা—১০০ মিলিগ্রামের ২টো বড়ি দিনে দু-বার, তিনদিন। দ্বিতীয় আরেকটা মনে রাখা আর খাওয়া আরও সহজ অ্যালবেন্ডাজোল (albendazole) —একদিন ৪০০ মিলিগ্রামের একটা বড়ি খেলেই হয়।

এ ছাড়া কৃমির আর যে সব ওষুধ আছে, সেগুলো ব্যবহার ডাক্তারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

পেট কামড়ে যখন ব্যথা, তখন কৃমির ওষুধ দেবেন না

সাধারণভাবে, পেটে গোল কৃমি থাকলেই পেট কামড়ে ব্যথা হয় না; অন্ত্রে জীবাণু-সংক্রমণ হলে ব্যথা হয়। জীবাণু-সংক্রমণে অন্ত্রে খিঁচ ধরে, তার কিছু অংশ সরু হয়ে যায়। সেখানে গোল কৃমি জমে গোলা বাঁধতে পারে। যাঁর পায়খানার সঙ্গে গোল কৃমি পড়ে, বা অন্য কোনোভাবে জানা গেছে যে পেটে গোল কৃমি আছে, তাঁর পেট কামড়ে ব্যথা হলে তাঁকে জীবাণুনাশক এবং পেট মোচড়ের ব্যথা কমানোর ওষুধ দিতে হবে। সেই ব্যথা কমলে তবে কৃমির ওষুধ দেওয়া যাবে।

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, জেনারেল ফিজিসিয়ান। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি হাওড়ার একটা ক্লিনিকে সব সময়ের চিকিৎসক।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

খুশকি

খুশকি নিয়ে কদাপি ভোগেননি এমন কেউ আছেন কি? বোধহয় না। খুশকির কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা আর ভবিষ্যৎ জানাচ্ছেন—**ডা. জয়ন্ত দাস।**

প্র: খুশকি কী?

উ: আমাদের মাথা থেকে মৃত চামড়ার কোষ, ও ধুলোময়লা ঝরে পড়ে। সেটা যখন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে তখন সেটাকেই বলি খুশকি বা মরামাস।

প্র: খুশকি কি তাহলে কোনো রোগ নয়? স্বাভাবিক ব্যাপার?

উ: ওই যে বললাম, যখন স্বাভাবিক ব্যাপারটাও অসুবিধা সৃষ্টি করে, তখন সেটাকে খুশকি বলতে হবে। সবসময়েই আমাদের চামড়ার একেবারে ওপরের স্তর থেকে চামড়ার মৃত কোষ ঝরে পড়ে। শরীরের অন্য অংশে সাধারণত বোঝা যায় না; যদিও অনেক দিন স্নান না করে অপরিষ্কার থাকলে গা থেকেও সাদা ছালের মতো ওঠে—সেটা দেখতেও পাওয়া যায়। আর মাথায় যেহেতু চুলের আবরণ থাকে, তাই স্বাভাবিক মৃত কোষ ঝরে পড়াটা চুলের জালে খানিকটা আটকে যায়, ফলে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো দেখা যায়। সেটা এক ধরনের খুশকি।

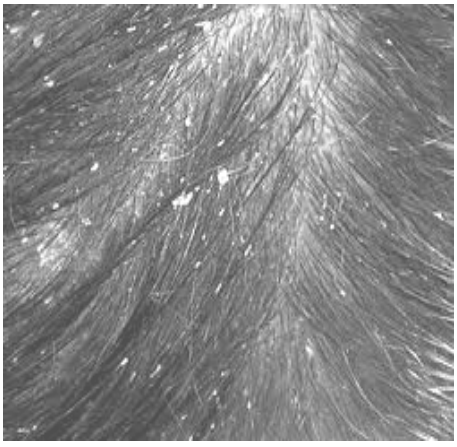

প্র: 'এক ধরনের খুশকি' বলছেন কেন? তাহলে কি অন্য ধরনের খুশকিও আছে?

উ: হ্যাঁ, অন্য ধরনের খুশকি তো আছেই। যে দু-টো রোগের লক্ষণ হিসাবে খুশকি আমরা খুব বেশি দেখি সে দু-টো রোগ হল সেবোরিক ডার্মাটাইটিস আর সোরিয়াসিস। এছাড়াও অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, এমনকী মাথার রিং-ওয়ার্ম জাতীয় ছত্রাক সংক্রমণেরও একটা লক্ষণ হতে পারে খুশকি। বেশ কিছু তুলনায় বিরল কারণও আছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা সাধারণ পাঠকদের খুব কাজে লাগবে না।

প্র: তাহলে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস আর তার জন্য খুশকি নিয়েই বলুন। এটা কি রোগ-ছাড়া খুশকির চাইতে অন্য রকম?

উ: সেবোরিক ডার্মাটাইটিসে খুশকি খুব সামান্য হতে পারে। তখন একে 'রোগ-ছাড়া খুশকি'র চাইতে আলাদা করার কোনো উপায় নেই—অন্তত মাথা, চুল আর খুশকি পরীক্ষা করে আলাদা করে চেনা যায় না। মাথায় খুশকি রয়েছে, মুখে বা ত্বকের অন্যত্র রয়েছে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস—এরকম ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই মাথার খুশকিটা হল 'সেবোরিক ক্যাপিটিস' অর্থাৎ মাথায় সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের আক্রমণ।

কিন্তু সেবোরিক ডার্মাটাইটিস থেকে অনেক সময় বেশি খুশকি হয়; তখন খুশকিটা হয় তেলতেলে। বড়ো বড়ো চাকলা হয়ে উঠতে পারে; নয়তো অজস্র সাদা গুঁড়ো হয়ে বেরোতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্যত্র সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের তেমন চিহ্ন না দেখতে পেলেও আমরা বলি মাথায় 'সেবোরিক ক্যাপিটিস' হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ভ্রূ আর চোখের পাতার রোমের গোড়ায়ও খুশকি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্র: আর সোরিয়াসিসের খুশকি কেমন হয়?

উ: মাথা থেকে অজস্র শুকনো সাদা গুঁড়ো বা সাদা চাকলা-বাঁধা চামড়া ওঠে। মাথার চামড়া ভালো করে না দেখলে একে সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের খুশকি থেকে আলাদা করা যায় না। সোরিয়াসিসে মাথার চামড়ার এক-একটা অংশ চারপাশের চামড়া থেকে একটু মোটা হয়ে উঁচু হয়ে থাকে, তাই পাশের স্বাভাবিক ত্বক আর সোরিয়াসিস-আক্রান্ত ত্বকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বর্ডার বা প্রান্ত থাকে। এই প্রান্ত দেখে বলা যায়— এটুকু হল স্বাভাবিক ত্বক, আর এইটুকু সোরিয়াসিস-গ্রস্ত ত্বক।

সেবোরিক ডার্মাটাইটিস (বা খুশকি তৈরি করে এমন অন্য কোনো চর্মরোগে) মাথায় স্বাভাবিক আর রোগগ্রস্ত ত্বকের এমন স্পষ্ট বিভাজন রেখা থাকে না। মাথায় সেবোরিক ডার্মাটাইটিস মাথার পুরো চামড়াকে আক্রমণ করতে পারে, বা একটা অংশকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক চামড়া আর রোগগ্রস্ত চামড়ার পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়, এ দুয়ের মাঝখানে স্পষ্ট বিভাজন রেখা থাকে না। স্বাভাবিক চামড়া আস্তে আস্তে আঁশযুক্ত বা খুশকিযুক্ত চামড়া হয়ে যায়, খানিকটা উঁচুও হয়তো হয়, কিন্তু একটা লাইন টেনে দিয়ে বলা যায় না যে লাইনের ডানদিকটা পুরো স্বাভাবিক, আর বাঁ-দিকটা পুরো সেবোরিক ক্যাপিটিস। সোরিয়াসিসে এই রকম লাইন টানা যায়।

প্র: আপনি সোরিয়াসিস আর সেবোরিক ডার্মাটাইটিস—দু-রকম খুশকির পার্থক্যের ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

উ: এ দু-টোতেই খুশকি হয়, কিন্তু এ দু-টোর চিকিৎসা অনেকটাই আলাদা। দু-টো রোগের ভবিষ্যৎও আলাদা।

প্র: চিকিৎসা কীকরম আলাদা?

উ: সেবোরিক ক্যাপিটিস-এ একটা ছত্রাক থাকে। সেই ছত্রাক সেবোরিক ক্যাপিটিস (বা সেবোরিক ডার্মাটাইসিস)-এর পুরো বা একমাত্র কারণ নয়, কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন। আমাদের দরকারি কথাটা হল, ছত্রাককে মারতে পারলে সেবোরিক ক্যাপিটিস-এর খুশকি কমে। তাই এতে মূল চিকিৎসা হল ছত্রাকনাশক শ্যাম্পু, ছত্রাকনাশক লোশন এবং যেহেতু এক ধরনের একজিমা গোত্রের রোগ, তাই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে স্টেরয়েড লোশন। আজকাল

ছত্রাকনাশক শ্যাম্পুতে সাধারণত কিটোকোনাজোল আর জেড পি টি ও (ZPTO) থাকে; ছত্রাকনাশক লোশনে ক্লোটাইমাজোল বা মাইকোনাজোল ইত্যাদি থাকে। মুখে খাবার ছত্রাকনাশক (যেমন ফ্লুকোনাজোল) কিছু ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে।

সোরিয়াসিসে ছত্রাকনাশক ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই। তাই মাথায় সোরিয়াসিস থেকে খুশকি হলে কোল টার যুক্ত শ্যাম্পু, কোল টার লোশন বা মলম, দরকারে স্টেরয়েড লোশন, ম্যালিসাইলিক অ্যাসিড (অনেক সময় স্টেরয়েড লোশনের সঙ্গে মেশানো)— এইসব ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও কিছু ওষুধ আছে যেমন ক্যালশিপোট্রিয়ল, একটা ভিটামিন-'ডি'-জাত যৌগ; এগুলো দামি। সুতরাং ব্যবহার কম করা হয়। আর মাথায় সোরিয়াসিসের সঙ্গে যদি গায়ে অনেক জায়গায় সোরিয়াসিস থাকে তবে মুখে খাবার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দিতে হয়—যেমন মেথোট্রেক্সেট।

সেবোরিক ক্যাপিটিস হোক আর মাথার সোরিয়াসিস, সেটা চুলকালে কিছু দিনের জন্য মুখে খাবার অ্যান্টিহিস্টামিন বড়ি দেওয়া হয়। আর দু-টোতেই মাথায় তেল লাগানো নিষেধ।

জেনে রাখা দরকার, এইসব ওষুধগুলোর মধ্যে কিটোকোনাজোল বা জেড পি টি ও দেওয়া শ্যাম্পু আর অল্প মাত্রায় কোল টার যুক্ত শ্যাম্পু ছাড়া কোনো ওষুধই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা ঠিক নয়। এমনকী শ্যাম্পুগুলোও বেশিদিন ব্যবহার করতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই উচিত।

প্র: আচ্ছা, কোল টার মানে কি আলকাতরা? আর ওষুধগুলো নিজে ব্যবহার করলে কী ক্ষতি?

উ: হ্যাঁ, কোল টার মানে আলকাতরাই বটে! কিন্তু দরজায় রং করার আলকাতরা মাথায় দিলে খুশকি সারবে না, মাথায় ঘা হয়ে যাবে। আসলে এটা পরিস্রুত কোল টার; 'মেডিসিন' হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হতে গেলে কিছু বিশেষ যোগ্যতামান পেরিয়ে তবে সেটা ওষুধ বলে ছাড়পত্র পায়। সেটাকে দেখতে, স্পর্শ করতে বা শুঁকতে দরজায় রং করার আলকাতরার মতো লাগে না একেবারেই।

আর হ্যাঁ, ওষুধগুলোর তো সাইড এফেক্ট বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছেই। যেমন স্টেরয়েড লোশন বেশিদিন মাখলে চামড়া পাতলা ও স্পর্শকাতর হয়ে যায়, আরও কিছু ক্ষতি হতে পারে। খাবার ওষুধ নিজে খেলে নানা ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া নিজে চিকিৎসা করলে যেটা হতে পারে সেটা হল ভুল চিকিৎসা। মাথায় সোরিয়াসিস মনে করে ওষুধ লাগানো হচ্ছে, অথচ সেটা আসলে মাথার রিং-ওয়ার্ম ছত্রাক সংক্রমণ। এতে রোগ বেড়ে যাবে, স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

প্র: সেবোরিক ক্যাপিটিস বা মাথায় সোরিয়াসিস কি চিকিৎসায় সারে?

উ: দু-টো রোগই চিকিৎসা করলে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু 'চিকিৎসাতে পুরো সেরে যায়' এটা বলা যায় না। একটু আগে বলেছি, রোগ দু-টোর ভবিষ্যৎ আলাদা; তাই এ দু-টো রোগকে আলাদা করে বলতে হবে।

খুব ছোটো বাচ্চাদের এরকম সেবোরিক ক্যাপিটিস হয়, মাত্র সাত দিন বয়সে এটা শুরু হতে পারে। সেটা বাচ্চাদের শ্যাম্পু ব্যবহার করা, তেল ব্যবহার বন্ধ করা, ছত্রাকনাশক লাগানো—এসব করলে কম থাকে, আর কিছুদিন পরে নিজে থেকেই সেরে যায়। কিন্তু বড়ো বয়সে যে সেবোরিক ক্যাপিটিস হয় সেটা কৈশোর-যৌবন থেকে আরম্ভ হয়ে অনেক বছর থাকতে পারে। অনেক সময়েই এটা কয়েক বছর পরে সেরে যায়—হয়তো সামান্য কিছু খুশকি থাকে যাকে 'রোগ-ছাড়া খুশকি'র থেকে আলাদা করা যায় না, আলাদা করার কোনো দরকার তেমন নেই। বছরের পর বছর ধরে খুশকির জন্য নিয়মিত শ্যাম্পু করা আর হয়তো-বা লোশন লাগানো খুব ক্লান্তিকর, কিন্তু এটা ছাড়া উপায় নেই। খুশকি খারাপ দেখায়, মাথা চুলকায়, আর চুলও পড়ে যায়—সুতরাং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেই হয়— একেবারে সারিয়ে তোলাটা চিকিৎসকের হাতে নয়। কিন্তু মাঝবয়সের পর এই রোগ সাধারণত সেরে যায়, এই যা বাঁচোয়া।

সোরিয়াসিস ব্যাপারটা আলাদা। যেকোনো বয়সেই এটা হতে পারে, আর মাথার চামড়া হল সোরিয়াসিসের সবচেয়ে 'প্রিয়' জায়গা। তবে একদম ছোটো বয়সে মাথায় সোরিয়াসিসের চাইতে সেবোরিক ক্যাপিটিস (বা আটোপিক ডার্মাটাইটিস) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর এই বয়সে এগুলো আলাদা করে চেনা বেশ শক্ত। কৈশোর-যৌবন-মধ্যবয়স-বৃদ্ধবয়স-— যেকোনো সময়ে সোরিয়াসিস শুরু হতে পারে। মাথায় হোক বা অন্যত্র, কবে যে এ রোগ পুরো সারবে তা বলা যায় না— চিকিৎসকরা কিছু কিছু লক্ষণ দেখে কতকটা আন্দাজ করতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারেন না কবে সারবে। অনেক সময় চিকিৎসা করে এবং কিছু কিছু সময় চিকিৎসা ছাড়াই, সোরিয়াসিসের সব রোগলক্ষণ উধাও হয়ে যায়, মনে হয় যেন চিরকালের মতো সেরে গেল। কিন্তু চিকিৎসকরা জানেন, এই 'সেরে যাওয়া' দু-মাস চলতে পারে, আবার আজীবনও চলতে পারে; তাই তাকে 'সেরে যাওয়া' (cure) না বলে 'প্রশমন' (remission) বলাটাই দস্তুর।

> বেশি খুশকি হলে, বা কম/বেশি খুশকির সঙ্গে মাথায় বেশি চুলকানি বা রস পড়া, বা মোটা চাকলা-মতো খুশকি হলে, বা মাথায় দুর্গন্ধ হলে, নিজে চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না—ডাক্তার দেখান।

প্র: চিকিৎসায় যদি না-ই সারে, তা হলে ডাক্তার না দেখিয়ে ওষুধের দোকান থেকে শ্যাম্পু, লোশন লাগালে কী ক্ষতি?

উ: ক্ষতি অনেকগুলো। প্রথম ক্ষতি ভুল রোগ নির্ণয়জনিত। যদি মাথায় রিং-ওয়ার্ম ছত্রাক হয়, আর সেটাকে রোগী বা ওষুধ-দোকানের দোকানদার সোরিয়াসিসের ওষুধ দেয় তো সেটা মাথাতে ছড়িয়ে পড়বে, স্থায়ী ক্ষতি হবে, স্থায়ী টাক পড়বে—এটা একটা মাত্র উদাহরণ। দ্বিতীয় ক্ষতি, সঠিক

ওষুধ সঠিক সময়ে না পড়লে রোগটার যতটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সেটা হবে না, রোগের লক্ষণ ও কষ্ট বেশি হবে। তৃতীয় ক্ষতি, ভুল সময়ে ভুল মাত্রায় ওষুধ দেওয়ার ফলে ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট বেশি হবে।

প্র: আচ্ছা, ডাক্তারের কাছে না হয় যেতে হবে, কিন্তু চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর কাছেই কি যাওয়া দরকার? মানে, জেনারেল প্র্যাকটিশনার নিশ্চয়ই এ চিকিৎসা করতে পারবেন?

উ: এই প্রশ্নের উত্তরে যাই বলি না কেন, বিতর্কের অবকাশ থাকবেই। খুশকির চাইতে 'কমন' রোগ বোধহয় আর কিছু নেই, সেটার জন্য চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাবার দরকার হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমবিবিএস কোর্সে 'কমন' রোগের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, চর্মরোগ চিকিৎসাও খুব পাত্তা পায় না। তাই আমি নিজেই এমবিবিএস করার পরে খুশকির ঠিক চিকিৎসা করতে পারতাম না, সেটা এখন বুঝি। হয়তো আমার বন্ধুরা বা এখন যাঁরা পাশ করছেন তাঁরা, এসব শিখছেন, তাঁরা ঠিক চিকিৎসা করবেন। আমি বরং এককথায় বলব, জেনারেল প্র্যাকটিশনার অর্থাৎ এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে প্রথমে যান, তিনি দরকার বুঝলে স্কিন-স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাবেন।

প্র: আচ্ছা, 'ক্রেডল ক্যাপ' বলে একরকম বাচ্চাদের খুশকির কথা বললেন না তো?

উ: 'ক্রেডল ক্যাপ' হল বাচ্চাদের মাথায় সেবোরিক ক্যাপিটিসজনিত খুশকি, যাতে বেশ তেলতেলে হলদেটে আঁশ মাথার সঙ্গে আটকে থাকে, সহজে ছাড়ানো যায় না।

আর শুধু 'ক্রেডল ক্যাপ' কেন, বলিনি তো অনেক কিছুই। সেবোরিক ডার্মাটাইটিস আর সোরিয়াসিসে মাথা ছাড়া অন্যত্র ত্বকে কেমন ক্ষত বা আঁশ হয়, সেসব বলিনি। অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস বা রিং-ওয়ার্ম ছত্রাক সংক্রমণে যে খুশকি বা খুশকির মতো দেখতে আঁশ ওঠে, সে সম্পর্কে কিছু বলিনি। অন্যান্য বিরল রোগে খুশকির মতো আঁশ ওঠে, তাদের নামটামগুলিও বলিনি। এত কিছু বলতে গেলে ডাক্তারি বই হয়ে যাবে তো!

প্র: ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওসব বলার দরকার নেই। শেষে শুধু এক কথায় বলুন তো, "খুশকি হলে কী করণীয়?"

উ: অল্প খুশকি হলে মাথায় তেল বন্ধ রাখুন, বেশি (এক দিন অন্তর এক দিন) শ্যাম্পু করুন, না কমলে ZPTO বা কিটোকোনাজোলযুক্ত শ্যাম্পু করুন। তাতেও না কমলে ডাক্তার দেখান।

বেশি খুশকি হলে, বা কম/বেশি খুশকির সঙ্গে মাথায় বেশি চুলকানি বা রস পড়া, বা মোটা চাকলা-মতো খুশকি হলে, বা মাথায় দুর্গন্ধ হলে, নিজে চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না—ডাক্তার দেখান।

| ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি বেসরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটে ত্বকরোগ বিভাগের অধ্যাপক।
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অভিজিৎ পাল। |

ওষুধ শিল্পে একচেটিয়া আগ্রাসন

ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. সুজয় কুমার বালা
ডা. পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা

প্রাপ্তিস্থান: শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র
চেঙ্গাইল, বেলতলা, হাওড়া

ডা. শ্যামল ব্যানার্জী– একজন অনুচ্চারিত চিকিৎসকের নাম

সংকলক: স্বপন শীল

হ্যাঁ, মানিক সাউ এখনও বেঁচে আছেন। বর্তমান নিবাস: ১৪২, বি এল নং-১৮, নিউকাট রোড, কাঁকিনাড়া, থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা। ডা. শ্যামল ব্যানার্জীর কাছ থেকে নামটা জেনেছিলাম এবং ঠিকানা হিসেবে জেনেছিলাম মানিক সাউ কাঁকিনাড়ার ১২ নং গলির বাসিন্দা। অনেক আগেই মানিকবাবু ১২ নং গলি ছেড়ে বর্তমান ঠিকানার বাসিন্দা হয়েছেন। অনেক খোঁজখবর করে আমরা গত ১৮ অক্টোবর ২০১৪-তে মানিকবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। আমরা অর্থাৎ বর্তমান সংকলক, বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক শ্রী দীপক মজুমদার এবং নৈহাটি ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের সদস্য শ্রী অনুপম ভট্টাচার্য। পথ প্রদর্শক ছিলেন দু-জন স্থানীয় ছাত্র বন্ধু।

বিকেল ৫-৩০ মিনিট নাগাদ আমরা পৌঁছোলাম। মানিক আগে থেকেই জানতেন আমরা তাঁর বাড়ি আসব। তিনি আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দু-চারজন কচিকাঁচা দরজা-জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে সলজ্জ চাহনিতে আমাদের দেখতে লাগল। ওদের দিকে আমাদের চোখ পড়তেই মানিকবাবু বললেন, 'ওরা আমার নাতি-নাতনি। হিন্দিভাষী হওয়া সত্ত্বেও স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি ও নিজের স্ত্রী—এই নিয়ে ওঁর ভরা সংসার। এরকম ভরা সংসার তো মানুষের থাকেই। তবে মানিকবাবুর ভরা সংসার ব্যতিক্রম কেন? আসলে মানিক সাউর মৃত্যুটা ১৯৬০-এর এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে কোনো একদিন নিশ্চিত ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের তথ্য অনুযায়ী এরকম নিশ্চিত মৃত্যুর দরজা থেকে বেঁচে ফিরে আসার সংখ্যা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত মাত্র সাত। মানিক সাউর নামটা যোগ হলে সংখ্যাটা আট হতে পারত। কিন্তু হয়নি কারণ ডা. শ্যামল ব্যানার্জী ভালোভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেননি। ডা. শ্যামল ব্যানার্জীর নাম বলতেই মানিকবাবুর চোখে-মুখে এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতার ছাপ লক্ষ করলাম। চুয়ান্ন বছর পূর্বের স্মৃতি রোমন্থন করে মানিকবাবু তার বেঁচে থাকার কাহিনি শোনালেন।

> ১৯৬০-এর গ্রীষ্মকাল। মানিকবাবুর বয়স তখন ১৬ বছর, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন পথের কুকুর পায়ে কামড়ে দেয়। ভয়ে বাবা-মাকে মানিক কিছুই বলেননি। কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন তিনি উপলব্ধি করলেন তার গলায় খুব ব্যথা এবং জল ও অন্য কোনো খাবার খেতে প্রচণ্ড কষ্ট। এক সময় খাওয়া বন্ধই হয়ে গেল। স্থানীয় এক কোয়াক চিকিৎসকের পরামর্শে তার বাবা তাকে নিয়ে নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে জলাতঙ্কের সমস্ত উপসর্গ মানিকের শরীরে স্পষ্ট। হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণও মানিকের জলাতঙ্ক রোগ নির্ণয় করে তার বাবাকে তাদের অসহায়তার কথা জানালেন। অবধারিত মৃত্যুর কথা বুঝে মানিকের বাবা দু-দিন বাদে মানিককে বাড়ি নিয়ে এলেন।

এর পরের ঘটনা আমরা ডা. শ্যামল ব্যানার্জীর মুখে শুনব।

ডা. শ্যামল ব্যানার্জীর নাম এবং এই ঘটনাটা ভাসা-ভাসা ভাবে অনেকদিন আগেই জানা ছিল। বিশদভাবে জানার সুযোগটা হঠাৎ করেই ঘটে গেল। বিজ্ঞান দরবার পরিচালিত 'বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচি-২০১৪'-তে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার অভিযানের বিষয়বস্তু ছিল 'আতসবাজির বিপদ'। ২০১৪-র জুলাই-আগস্ট জুড়ে কল্যাণী-কাঁচরাপাড়া-হালিশহর অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের কাজ চলছিল। জোনপুর গার্লস স্কুলে এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান দরবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী মনোমিতা ব্যানার্জী। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল তিনি ডা. শ্যামল ব্যানার্জীর মেয়ে। তার সহযোগিতায় আমরা অর্থাৎ বর্তমান সংকলক, দীপক মজুমদার, শুভময় বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ দাস ও সজল শীল গত ৬ অক্টোবর ২০১৪ ডা. ব্যানার্জীর মুখোমুখি হই। ডা. ব্যানার্জী যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে আমাদেরকে সেই বিরল ঘটনাটি শোনালেন।

> সময়টা ১৯৬০ সালের এপ্রিল-মে মাসের কোনো একদিন। ডা. ব্যানার্জী কাঁকিনাড়া স্টেশনের কাছে একটা চেম্বারে রোগী দেখতে ব্যস্ত। স্থানীয় এম.এল.এ. শ্রী সীতারাম গুপ্ত এক ভদ্রলোককে নিয়ে তার চেম্বারে ঢুকলেন। পারস্পরিক কথাবার্তায় তিনি জানলেন ভদ্রলোকের ছেলে শ্রী মানিক সাউ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত। এই রোগের যে কোনো চিকিৎসা নেই এবং পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু তা শ্রীগুপ্ত ও ভদ্রলোক উভয়ের কাছে জানা। তবুও একটা শেষ চেষ্টার অনুরোধ ডা. ব্যানার্জী আর ফেরাতে পারেননি।
>
> তিনি অনেক ভেবেচিন্তে নিম্নলিখিত ওষুধগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেন।
>
> 1. Anti-rabis Vaccine, 10ml., I.M., daily for 14 days.
> 2. Chlorpromazine hydrocholoride, 50mg. I.M. twice daily for 5 days.
> 3. Cyanocobalamine, 100mg., I.M. for 14 days.
> 4. Glucose (125 percent), 500 ml. with 1.0 gm.

ascorbic and 1ml. Cardiazol, I.V. daily for 5 days.

5. Phenergan, 25mg., I.M. daily for 10 days.

অবশ্যই ভ্যাক্সিন ছিল মূল প্রতিষেধক। দ্বিতীয় ওষুধটা ছিল কোনোরকম কনভালসন (Convulsion) ঠেকানোর জন্য। তৃতীয়টি স্নায়বিক সতেজতার জন্য, চতুর্থটি খাবার হিসেবে ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে সবল রাখার জন্য এবং পঞ্চমটি ছিল অ্যালার্জি প্রতিরোধক হিসাবে।

চিকিৎসার তৃতীয় দিনে মানিক দুধ জাতীয় তরল খাবার খেতে সক্ষম হলেন, সপ্তম দিনে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন এবং দশম দিনে হাঁটতে সক্ষম হলেন। চোদ্দদিনের মাথায় ওষুধ প্রয়োগ শেষ হওয়ার পর ক্রমশ মানিক সুস্থ হয়ে উঠলেন। এর পর ছ-মাস পর্যন্ত ডা. ব্যানার্জী মানিকের ওপর নজর রেখেছিলেন।

ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ভাবনাচিন্তা অবশ্যই ছিল। তা সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। র‍্যাবিস সংক্রমণের পরেও ভ্যাকসিন কীভাবে কার্যকর হল সে ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত আরও কয়েকটা কেস স্টাডির প্রয়োজন ছিল যা ডা. ব্যানার্জীর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অলভ্যতার কারণে সম্ভব হয়নি। অবশেষে তিনি গোটা বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (I.M.A.)-এর জার্নালে পাঠান। বেশকিছু প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর 'CAN RABIES BE TREATED SUCCESSFULLY?' — শিরোনামে ডা. ব্যানার্জীর লিখিত প্রতিবেদনটা *JIMA*-এর Vol.-40, No.8, April 16, 1963, P-389- তে প্রকাশিত হয়।

আজ চুয়ান্ন বছর পরেও ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটনাটির প্রাসঙ্গিকতা কিছু কম নয়। ভারতে প্রতি বছর ২০,০০০-এরও বেশি মানুষ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, যা পৃথিবীতে প্রতি বছর যত মানুষ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তার অর্ধেকের বেশি। অথচ একজন মানুষেরও জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ারই কথা নয়। কুকুরে বা অন্য কোনো স্তন্যপায়ী জন্তু কামড়াবার পর প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের (অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন) প্রয়োগ জলাতঙ্ক প্রতিরোধকে একশো ভাগ নিশ্চিত করে। ভারতের এত বিশাল সংখ্যক মানুষের জলাতঙ্কে মৃত্যুর একটা বড়ো কারণ এখনও অগণিত মানুষের কালো জাদুর (Black magic) উপর বিশ্বাস। মানিক সাউ-এর মতো জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুকুরে কামড়ালে মানুষ কলাপড়া-থালাপড়া প্রভৃতি তুকতাক করেই ক্ষান্ত থাকে। ফলে যেসব কামড়ে র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে না তারা স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে যায় এবং যেসব কামড়ে র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে সেসব ক্ষেত্রে জলাতঙ্কের সংক্রমণ ঘটে যার পরিণতিতে মৃত্যু অবধারিত। এটা ঠিকই কালো জাদুর উপর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা যত হ্রাস পাবে জলাতঙ্কে মৃত্যুর সংখ্যাও তত হ্রাস পাবে। কিন্তু এ কাজটা বাস্তবিক বড়ো কঠিন। কালো জাদুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দেশে সব চাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক সরকার নিজে। ভারতরাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য যারা প্রতিনিয়ত সরকারে আসে-যায় ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজনৈতিক দলগতভাবে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই কালো জাদুর বিরুদ্ধে নয়। তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও কালো জাদুর রমরমা। কালো জাদুর মদতকারীরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষদের প্রয়োজনে খুন করতেও পিছপা হয় না। হিন্দু সেনাদের দ্বারা ডা. নরেন্দ্র দাভোলকারের খুন এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তবুও কালো জাদুর বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজসচেতন মানুষদের সংগ্রাম চলবে। কিন্তু জলাতঙ্কে মানুষের মৃত্যু তো থেমে থাকবে না। অতএব ভারতের মতো দেশে ভ্যাকসিনের সঙ্গে জলাতঙ্কের চিকিৎসা ব্যবস্থারও আবশ্যকতা রয়েছে। ডা. ব্যানার্জীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধরে আর একটু ভাবনাচিন্তা করা যায় না? আর একটু এগিয়ে যাওয়া যায় না?

CAN RABIES BE TREATED SUCCESSFULLY?

SHYAMAL BANERJEE, M.B.B.S., D.T.M. & H.
Naihati

Can Rabies be Treated Successfully?

A Hindu male child aged about 12 years developed typical signs and symptoms of rabies. Parents narrated that the boy was bitten by a dog about 30 days ago. The dog expired a few days after the bite. The boy received no treatment after the dogbite and was behaving normally until the onset of the present illness.

On the second day of the onset of symptoms the patient was seen by local physicians who advised immediate admission of the child to a hospital in Calcutta for treatment. In Calcutta a diagnosis of rabies was made. Out of fear the parents took their boy home from the hospital only two days after admission.

At that stage, the boy came to the writer with the following complaints: (1) spasms of both upper and lower limbs (2) inability to take any solid or liquid food, (3) inability to speak and (4) constant salivation. The following treatment was undertaken:

1. Anti-rabis Vaccine, 10ml., I.M., daily for 14 days;
2. Chlorpromazine hydrocholoride, 50mg. I.M. twice daily for 5 days.
3. Cyanocobalamine, 100mg., I.M. for 14 days.
4. Glucose (25 per cent), 500 ml. with 1.0 gm. ascorbic acid 1.0g. and cardiazoi and 1ml, I.V. daily for 5 days.
5. Phenergan, 25mg., I.M. daily for 10 days.

After three days of treatment the patient was able to take milk. On the 7th day he was able to stand up from his bed. On the 10th day he was able to walk out from his room. Treatment was carried on up to the 14th day. The patient was followed-up regularly for about 6 months, but no abnormality has since been detected in his system.

To my knowledge there is no referrence in the literature of any case of rabies which has come round after the onset of signs and symptoms. Probably this is the first case to be recorded on this subject.

Naihati
24 Parganas.

SHYAMAL BANERJEE
M.B.B.S., D.T.M. & H.

Reprinted from the Journal of the Indian Medical Association, Vol.40, No.8, April 16, 1963, P.389.

| স্বপন শীল, বিজ্ঞানকর্মী, উত্তর ২৪ পরগনার একটি বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। |

সম্পাদকীয় মন্তব্য:

জলাতঙ্ক হলে মৃত্যু অবধারিত, এমনটাই আমরা জানি। সারা পৃথিবীতে জলাতঙ্ক হওয়ার পর সেরে ওঠার ঘটনা বিরল।
এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন গণ বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন বহুদিনের সংগঠক। প্রতিবেদনে বর্ণিত 'কেস'-টির রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সর্বমান্য জার্নালে। তাই আমরা প্রতিবেদনটি ছাপালাম। তবু ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থেকেই যায়।

- **চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব**
- **চিকিৎসা পণ্য নয়, মানবিক অধিকার**

With Best Compliments from :

IPCA / BIONOVA

63-E, Kandivili Industrial Estate
Kandivli(West)
Mumbai-400067